মানুষ রবীন্দ্রনাথ

বনবিহারী মুখোপাধ্যায়

মানুষ রবীন্দ্রনাথ

মানুষ রবীন্দ্রনাথ

কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়

মহাজাতি সদনের প্রাক্তন কর্মসচিব

॥ প্রকাশনা । শ্রীনাথ নিবাস । কোন্নগর ॥

"রজনীগন্ধা অগোচরে
যেমন রজনী স্বপনে ভরে সৌরভে
তুমি জান নাই, তুমি জান নাই,
তুমি জান নাই, মরমে আমার ঢেলেছ তোমার গান।"

দ্বিতীয় সংস্করণের সম্বন্ধে

নিবেদন

সংসারে মানুষের চেয়ে মানুষের কীর্তিই বড়।

কিন্তু সময়ে সময়ে এমন এক-একজন মহাজন জন্মগ্রহণ করেন, যাঁর সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম খাটে না। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এমনি একজন মহাজন। তাঁর লেখা কাব্য অপরূপ, সন্দেহ নেই। কিন্তু তেমনি অপরূপ ছিলেন তিনি মানুষটি। কীর্তি ছাড়াও তাঁর ভিতরে এমন কিছু ছিল, যার সম্বন্ধে আমরা চুপ করে থাকতে পারি না। মানুষটি নিজেই ছিলেন এক অপূর্ব মহাকাব্য।

শত্রু হোক, মিত্র হোক, তাঁর কাছে গিয়ে কেউ তাঁর সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে থাকতে পারতেন না। তাঁর মত ব্যক্তিত্ব পৃথিবীর ইতিহাসে খুব কম দেখা যায়। তাঁর কাছে দাঁড়ালে হিমালয়ের কথা মনে পড়ত। তিনি ছিলেন পুরুষশ্রেষ্ঠ। বিশাল ছিল তাঁর দেহ, বিশালতর ছিল সেই দেহাশ্রয়ী ব্যক্তিত্ব। রবীন্দ্রকাব্য একান্ত যত্নের পাঠ্যবস্তু। মানুষ রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করতে বসলে বোধ হয় এ কাজও তাঁর কাব্যের মত বিস্ময়কর। মানুষের দেশে তিনি মানুষ হয়েই এসেছিলেন, তবু যেন চারিদিকের পৃথিবীতে তাঁর মিল খুঁজে পাওয়া যায় না।

অবশ্য রবীন্দ্রকাব্য রবীন্দ্রজীবনের সঙ্গে এমন নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে যে, মানুষ রবীন্দ্রনাথকে না বুঝলে তার মর্মমূলে পৌঁছানো দুঃসাধ্য। তাঁর রচনাবলীর ঠিক ঠিক বিশ্লেষণের জন্য আগে চাই তাঁর ব্যক্তিত্বের মূল রূপটির সন্ধান। কিন্তু সে প্রয়োজন ছাড়াও রবীন্দ্রচরিত্রের নিজস্ব একটি আকর্ষণ আছে।

প্রবাদ আছে, বুদ্ধের আগে অনেক বুদ্ধ জন্ম নিয়েছিলেন। এক বুদ্ধের কথা সকলের কাছে পরিচিত। অন্যেরা চিরকাল অজানা থেকে গেলেন। সংসারে যে মহাপুরুষের জীবন লোকচোখে ফলে

ফুলে ফুটে ওঠে, তাঁর কথা আমরা জানতে পারি। তাঁকে নিয়ে রচনা করি আমাদের গোষ্ঠীজীবনের ইতিবৃত্ত। কিন্তু লোক-চোখের অগোচরে আরও কত মহাজন জীবন দিয়ে সৃষ্টি করে যান নব নব আন্দোলনের পরিমণ্ডল। সংসারীর চোখে তাঁদের জীবন সাফল্যের গৌরবে মহৎ নয়। তবু ব্যক্তিহিসাবে তাঁরা অবহেলার নন। তাঁরা যে মহাশক্তির উৎস নিয়ে জন্ম নেন, সেই শক্তির দ্যুতিতে মহনীয় হয়ে ওঠে তাঁদের বিরাট ব্যক্তিত্ব। যাঁরা সাধারণ নন, যাঁরা সন্ধানী, তাঁদের কাছে সেই বিরাট ব্যক্তিত্বের কাহিনী খুবই চিত্তাকর্ষক।

রবীন্দ্রনাথের কাছে গেলে আমার মনে প্রায় সেই কথা জাগত। তিনি ভাগ্যের কোন আকস্মিক অনুগ্রহে কীর্তি প্রতিষ্ঠা করে যাননি। পরম চেষ্টায় প্রচণ্ড সাধনার দ্বারা অর্জন করে গেছেন কালবিজয়ী নাম। কিন্তু যদি এমন হত যে, অদৃষ্টের কোন যোগা-যোগে তিনি তাঁর রচনাবলী সৃষ্টি না করতেন, তবু তাঁর ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসে কোন সন্ধানী মানুষ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে থাকতে পারতেন না। এমনই বৈদ্যুতিক উপাদানে তাঁর ব্যক্তিত্ব গড়া ছিল। মনে হয়, সকল দেশের সকল কালের মানদণ্ডেই রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিরাট পুরুষ। তাঁর উদ্দেশে সত্যিসত্যিই বলা যায়, “তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ”।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের বিশেষত্ব শুধু বিরাট রূপে নয়—বিচিত্র রূপে।

১৯৩৭ সালের কথা। তখন সবেমাত্র কঠিন রোগ থেকে উঠেছেন। সম্পূর্ণ আরোগ্য হন নি। একটু একটু করে সেরে উঠছেন। শান্তিনিকেতনে কদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হবার পর সেদিন বিকালে আকাশ ভরে শুরু হয়েছিল শেষ রোদের খেলা। মহাকবি বেশ খুশী মনে বসে বসে তা দেখছিলেন। এমন ক্ষণে মানুষ মানুষকে স্বভাবতঃই অন্তরঙ্গ কথা বা ভুলে-যাওয়া ঘটনার গল্প বলেন। আমি সুযোগ বুঝে মহাকবিকে বললুম, যতই আপনাকে

দেখছি, ততই মনে হচ্ছে, আপনার কবিতার চেয়ে আপনি মানুষটি কোন অংশে ছোট নন। আশ্চর্যের কথা এই যে, আজও আপনার একটা সত্যিকার জীবনী বার হল না।

তিনি হালকা মেজাজে হাসতে হাসতে জবাব দিলেন, না। যারা আমার কথা লিখতে পারত, যারা আমাকে ছেলেবেলা থেকে জানত, তারা সবাই শেষ হয়ে গেছে। আমি যে বড় বেশী দিন বেঁচে আছি!

ক্ষণিকের জন্য তাঁর মনের পটে যেন একসারি স্মৃতির ছবি ভেসে উঠল। তিনি কয়েক মুহূর্ত আনমনা হয়ে যাবার পর আবার সচেতন হয়ে বক্তব্য শেষ করলেন, আর দেখ, এর আরও একটি দিক আছে। আমি নানাদিকে কাজ করেছি। আমার বীণায় এত বিচিত্র তার যে, আমার মত আর একজন ছাড়া অপরের পক্ষে আমার জীবনী লেখা কঠিন।

রবীন্দ্রনাথের অন্তরে ছিল অনেকগুলি সত্তা। প্রতিভাশালী চরিত্রের মধ্যে প্রায়ই থাকে একাধিক সত্তা। হয়ত একদিন এ তথ্য প্রমাণিত হবে, সব মানুষই একাধিক মানুষের সমষ্টি। কিন্তু সাধারণ মানুষের চরিত্রে যাদের শুধু আভাসে পরিচয় পাওয়া যায়, মহাজনদের ব্যক্তিত্বে তারা নির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে থাকে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বহুরূপী মানুষ। কবি তিনি, কথাশিল্পী তিনি, নট তিনি, সুরস্রষ্টা তিনি, চিত্রকর তিনি, শিক্ষাব্রতী তিনি। এ ত তাঁর বাইরের জীবনের রূপ! অন্তরেও তিনি ছিলেন বহুরূপী।

শুধু তাই নয়। তাঁর বহুরূপের মধ্যেও বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁর মহাসত্তার মধ্যে ছিল বিচিত্রধর্মী, বিপরীতমুখী বহু খণ্ড-সত্তা। তাই রবীন্দ্রনাথ অন্তর থেকে বিচিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে সৃষ্টিশক্তি প্রয়োগ করার প্রেরণা পাননি, পেয়েছেন পরস্পরবিরোধী ক্ষেত্রে আত্ম-নিয়োগ করার মহাশক্তি। চিত্রশিল্পী মাইকেল এনজেলো চমৎকার চমৎকার সনেট লিখে গেছেন। ইংরেজ কথাশিল্পী টমাস হার্ডি

উচ্চশ্রেণীর কবিও ছিলেন। কিন্তু তাঁদের সৃষ্টিশক্তি প্রবাহিত হয়েছিল বিভিন্ন অথচ সমধর্মী ক্ষেত্রে। শোনা যায়, চীনদেশে কোন কোন সম্রাট কবিতা লিখে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। ভারতের বিবেকানন্দ অদ্বৈতসাধক সন্ন্যাসী হয়েও তাঁর পরম লক্ষের সন্ধান পেয়েছিলেন আর্ত মানুষগোষ্ঠীর সেবায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বে ছিল আরও পরস্পরবিরোধী খণ্ডসত্তার প্রভাব।

বইখানিতে মহাকবির সেই বহুরূপী মহাসত্তাকে নিয়ে আলোচনা আছে।

১৯৩৬ সালের অগাস্ট মাসে আমি শান্তিনিকেতনে যোগদান করি। তখন তরুণ বয়স। সবেমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করেছি। বিশ্বভারতীতে প্রথমে পাই পাঠভবন ও শিক্ষাভবনে অধ্যাপনার ভার। পরে আমার উপর আরও গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। মহাকবির প্রত্যক্ষ পরিচালনায় তাঁর গ্রন্থ সম্পাদনা-দপ্তর সংগঠনের কাজ শুরু করি। অফিসিয়াল নাম দিলে হয়ত সে পোস্টের নাম হতে পারত লিটারারী সেক্রেটারী। ১৯৩৮ সালের জুলাই মাসের শেষ দিকে শান্তিনিকেতন থেকে চলে আসি।

১৯৩৯ সালের জানুয়ারী মাসে এই বইখানি প্রকাশিত হয়। তারপর প্রায় ছ মাসের মধ্যেই প্রথম মুদ্রণ নিঃশেষ হয়ে যায়। এখানিই আমার লেখা প্রথম বই।

আজ প্রায় চব্বিশ বছর পরে দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হল। এই চব্বিশ বছর রবীন্দ্রসাহিত্য নিয়ে মনন চিন্তনে আমার কেটেছে। বর্তমান সংস্করণে মূল পাঠ কিছু কিছু পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করা গেল। তবে প্রথম সংস্করণে মোটামুটি যে মতামত প্রকাশ করা হয়েছিল, তার কোন পরিবর্তন ঘটেনি।

এই প্রসঙ্গে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা মানুষ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটি ছোট্ট প্রবন্ধ উদ্ধৃত করছি। বোধ হয়, ১৯৬১ সালের প্রথম দিকে তিনি মহাজাতি সদনে এসেছিলেন। মহাকবি বিদ্যালয়ের

কিশোর ছাত্রদের উপযোগী, নারীচরিত্র-বর্জিত "বিসর্জন" নাটকের একটি পাণ্ডুলিপি আমার কাছে রেখে যান। সেই বইখানি বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশের ব্যবস্থা সম্বন্ধে রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনা হয়। এই প্রসঙ্গে আমি মহাজাতি সদনের কর্মসচিব হিসাবে তাঁকে একটি অনুরোধ জানাই। তিনি যেন মহাজাতি সদনের কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে যে রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি উৎসব হবে তাতে সভাচার্যের আসন গ্রহণ করেন এবং মানুষ হিসাবে মহাকবি কেমন ছিলেন, সে সম্বন্ধে ভাষণ দেন। শেষ পর্যন্ত অসুস্থতার জন্য তিনি দেরাদুন থেকে সভায় আসতে পারেননি, তবে এই প্রবন্ধটি আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আমার বইখানিতে আমি যেসব কথার আলোচনা করেছি, তাদের ভূমিকা হিসাবে প্রবন্ধটি পাঠক-পাঠিকাদের কাছে নিশ্চয়ই খুব চিত্তাকর্ষক হবে ঃ

"Father was a creative artist in almost every phase of human thought and activity. He had so many facets to his genius that it is impossible for any one man to understand him completely. His poems, his prose writings, his songs, his paintings have given expression in various ways to his genius, but none of these help us to know the personality of the human Rabindranath. He remains as elusive as ever. Yet behind his complex genius he was intensely human.

"Father was extremely fond of his children, but he never lavished sentimental affection on them. He would play with us as though he was a child himself. I have never known a more loving nature and yet in all my experience I have never come across any one else who inspired such a sense of awe and reverence.

"Although not apparent to the casual observer and it may seem unusual to associate such a towering personality with it, my father was by nature extremely shy and sensitive. For consideration of others he would willingly suffer great physical or mental distress without showing any sign of it. He could at the same time be very capricious in his moods. At times, he would throw off all reserve and entertain friends with brilliant sallies of wit and humour ; at others he would withdraw completely within himself, making it impossible for others to fathom his thoughts. The changeable character of his mind quite often led to much misunderstanding. His receptive and imaginative mind would never accept anything as final. This applied not only to his daily life, his wanting always to change his habitation, his food, his dress and his surroundings but to his creative activities as well. The spirit of revolt against accepted principles and practices which characterized his mind coupled with the desire to experiment with new ideas, persisted till the last day of his life.

"It is surprising how he could compose poems and songs, write novels and essays—very often all at the same time—and yet receive so many visitors. That he could do so much writing over and above his other work and the time given to visitors, was due to the extraordinary power of concentration he possessed.

Some of his best poems have been written on railway trains, often under worse circumstances.

"Father's essentially optimistic and cheerful temperament combined with a sense of humour, helped him to overcome vicissitudes that pursued him relentlessly throughout his life. Financial worries were the least part of them. The death of my mother, when he was only forty-one and in the prime of his creative faculties, came as the first blow. My two sisters,my younger brother, two of my cousins—all those whom father loved the most—died one after another. The fortitude with which he bore the loss of his dearest ones was remarkable but what was even more remarkable was that the bereavements never made him lose his poise of mind, nor did his creative faculties cease to function for a single moment. On the contrary, his loss and sorrow seemed to have had an enriching influence of their own and gave greater depth and significance to his writings."

বিশ্বভারতীর শিক্ষাপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য কি—এ সম্বন্ধে অনেকে প্রশ্ন করে থাকেন। তাই অনুযোজনে শিক্ষাপদ্ধতি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পাচার্য শ্রীনন্দলাল বসুর কিছু কিছু মতামত প্রকাশ করলুম। নন্দলালবাবুর সঙ্গে আলোচনাটি আরও বড় আকারে "প্রবাসী"তে ছাপা হয়েছিল। এই সুযোগে তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ইতি।

স্বাঃ কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র
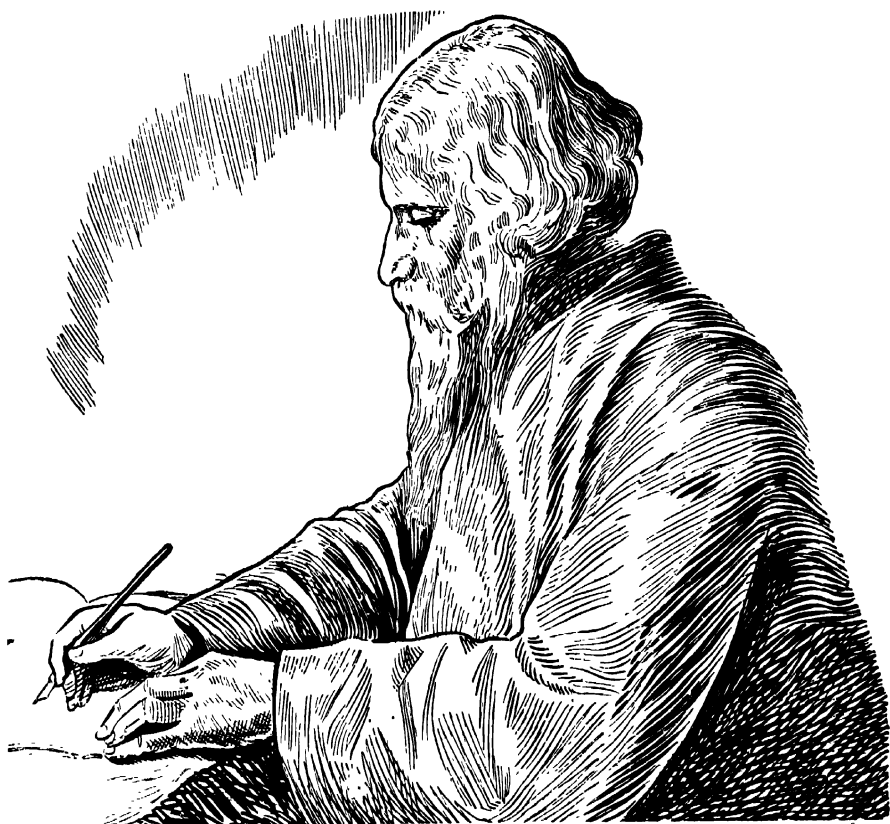
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মানুষ রবীন্দ্রনাথ

এক

মানুষের সত্তার রূপ মূলতঃ দুটি। একটি বাইরের, আর একটি ভিতরের।

ভিতরে বাইরে—দুক্ষেত্রেই পরম পুরুষ হয়ে জন্মেছেন, পৃথিবীতে এমন মহামানুষ সকল কালেই দুর্লভ। কারো চরম প্রতিভা আছে, নেই রূপ। কারোর বা অসামান্য শক্তি আছে, নেই সূক্ষ্ম রুচি-বোধ। আবার কারোর বা প্রতিভার তুলনায় রূপ ও রুচি নিতান্ত সাধারণ। রবীন্দ্রনাথ জন্মেছেন চরম শক্তিমান প্রতিভার সঙ্গে সেরা সৌন্দর্য ও বিচিত্র সূক্ষ্ম রুচির অধিকারী হয়ে। এদিক থেকে তিনি যেন প্রকৃতির এক বিরাট বিস্ময়। মহাকালের এক মহোত্তম সৃষ্টি।

এই অপরূপ অসামান্য[illegible]ই কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জীবনে সৃষ্টি করে তুলেছে এক অঘটন। মনে হয়, তাঁর সমকালীন মানুষেরা খুঁজে পাননি তাঁর সত্যকার পরিচয়। তাঁরা তাঁর বাইরের সত্তার মহিমা নিয়েই মুগ্ধ হয়ে মেতে আছেন। তাঁর জগৎ-জোড়া খ্যাতি ধাঁধিয়ে দিয়েছে তাঁদের দৃষ্টি।

কে না স্বীকার করবে, বাঙলা দেশের আধুনিক সংস্কৃতিবান সমাজের জীবন মুখ্যতঃ রবীন্দ্র-কেন্দ্রিক। কিন্তু এই গোষ্ঠী যেমন ব্যাপকভাবে মানুষ রবীন্দ্রনাথের থাকা-পরা, কথাবলা, হাতের লেখার অনুকরণ করেছেন, নিজেদের জীবনসাধনার ক্ষেত্রে কি তেমন গভীরভাবে করতে পেরেছেন মহাকবির পৌরুষদীপ্ত, বিপ্লবকর বাণীর অনুসরণ?

ইংলণ্ডের প্রথম যুগের রবীন্দ্রভক্তদের সম্বন্ধেও সন্দেহ জাগে। অবশ্য, ভারতের বাইরে রবীন্দ্রমহিমা প্রচারে তাঁদের দান চির-স্মরণীয়। তবু বলব, সেই বিদেশী ভক্তেরা রবীন্দ্রনাথের আকৃতির মধ্যে ক্রীস্টের আভাস পেয়ে এবং "গীতাঞ্জলি"র গানের মধ্যে বাইবেলের ধর্মসংগীতের প্রাণময়তা অনুভব করে আবেগে যত গদ্‌গদ হয়ে উঠেছিলেন, তত গভীরভাবে সন্ধান পান নি তাঁর কবি-প্রতিভার বিশালতার অথবা ব্যক্তি-সত্তার বিচিত্রতার।

অবাক হয়ে যাই, যখন ভাবি, এ পর্যন্ত কোন নামজাদা, ইংরেজ সাহিত্যিকের অনুবাদ-করা একটিও রবীন্দ্ররচনা প্রকাশিত হয়নি। রোমান্‌টিক যুগের ইংরেজী কাব্যসাহিত্যে আছে রহস্যবাদিতা, মননশীলতা ও সংবেদনময়তার চরম প্রকাশ। কিন্তু সেই ইংলণ্ডে অপূর্ব অতীন্দ্রিয়তায় সমৃদ্ধ, সংবেদনময় ও মননশীল রবীন্দ্রকাব্য নিয়ে এখনও হয়নি কোন নতুন ফিট্‌জেরাল্‌ডের আবির্ভাব। ইংরেজ রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা করেছেন, রবীন্দ্রপ্রতিভাকে আদর করতে পারেন নি।

রবীন্দ্রসাহিত্য নিয়ে ইউরোপ-আমেরিকায় যা কিছু আলোচনা হয়েছে, তাও খুব গভীর নয়। অক্সফোর্ডের বাংলাভাষার অধ্যাপক এডওয়ার্ড টমসনের লেখা বইখানিতে[১] আছে পবিত্র পরিশ্রমের পরিচয়, নেই অনুভূতির দীপ্তি। চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রাচ্যবিদ্যা-বিদ্‌ ভি, লেসনি এবং ইহুদী অধ্যাপক আরনসন্‌-এর বই দুটিতেও আছে শুধু রবীন্দ্রনাথের বাইরের পরিচয়, নেই তাঁর অন্তর্লোকের পরিচিতি।

তাই বলি, সমকালীন সমাজ মহাকবির বাইরের সত্তাটিকে দিয়েছেন বিশ্বজোড়া বন্দনা, ভিতরের মানুষটিকে কিন্তু করেছেন মূলতঃ অনাদর। অন্ততঃ, 'আজি হতে শতবর্ষ পরে' সাহিত্য-বিচারকদের মনে এ সন্দেহ জাগা অসম্ভব নয়।

১ "Rabindranath Tagore : Poet & Dramatist"

স্বভাবতঃ কালের প্রভাব দুরতিক্রমনীয়। তাই আমার মনেও রবীন্দ্রভক্তির প্রথম পর্ব শুরু হয় বাইরের রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই।

*

* *

আমাদের পরিবারে সাহিত্যচর্চার একটি পুরাতন পরিমণ্ডল ছিল। আমার বাবা ছিলেন একাজে সব চেয়ে অগ্রণী। অবশ্য, বঙ্কিম-মধুসূদন যুগের সাহিত্যের প্রতিই তাঁর ছিল বিশেষ প্রীতি। কিন্তু আমার একজন দাদা[১] হঠাৎ কলেজের এক তরুণ অধ্যাপকের কাছ থেকে উদ্দীপনা পেলেন, বাড়িতে শুরু করলেন 'রবীন্দ্র-সাহিত্যের সাধনা। তখন মহাকবির বই সংগ্রহ করা সহজ কাজ ছিল না। ছোট শহরের সাধারণ গ্রন্থাগারে তাঁর বই খুব কমই রাখা হত। কিন্তু হঠাৎ এক অভাবনীয় সুযোগ ঘটে গেল। মেজকাকার বই কেনার অভ্যাস ছিল। তাঁর বই-এর আলমারির এক উপেক্ষিত কোণ থেকে ১৩১১ সালে প্রকাশিত, হিতবাদী সংস্করণের একখণ্ড রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী আবিষ্কৃত হল।

তারপর দাদার সাহচর্যে চলল রবীন্দ্রসাহিত্যের চর্চা।

ক্রমে কলেজে পড়া শুরু করলুম। জীবনে ঘটল আর একজন সাহিত্যরসিক, রবীন্দ্রভক্তের[২] সংস্পর্শ। তিনি ছিলেন কলেজের ইংরেজী ভাষার অধ্যাপক। তাঁর প্রভাবে রবীন্দ্ররচনাবলী পড়ায় গভীরভাবে মেতে উঠলুম। বুঝতে পারলুম, যে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এতদিন পূজা করে এসেছি, 'এহ বাহ্য'। তাঁর সত্যিকার মূর্তি আরও মহৎ। বিশাল তিনি, শ্রেষ্ঠ তিনি, বিচিত্র তিনি। আমাদের মাটির দেশে তিনি পরম ধনের ধনী। এই অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে মনে জাগল রবীন্দ্রনাথকে কাছে পাবার প্রবল আগ্রহ।

১ চিত্রাভিনেতা শ্রীবিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায়

২ অধ্যাপক পশুপতি গঙ্গোপাধ্যায়।

১৯৩৩ সাল। তারিখ বোধ হয় ১৬ই জানুআরী। হঠাৎ অভাবিত এক সুযোগ এসে উপস্থিত হল। তখন আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী সাহিত্য পড়ি। কানে এল সেদিন মহাকবি তাঁর "কমলা বক্তৃতা"র প্রথম ভাষণ দেবেন। সভার আয়োজন করা হয়েছিল আশুতোষ ভবনের উপরকার হলে।

সেদিনের কমলাবক্তৃতা সভায় যে দুর্লভ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলুম, তা ঠিকঠিক বর্ণনা করে বলার সাধ্য আমার নেই। মহাকবি পড়তে লাগলেন, "মানুষের সত্তায় দ্বৈধ আছে। তার যে সত্তা জীবসীমার মধ্যে, সেখানে যেটুকু আবশ্যক, সেইটুকুতেই তার সুখ। কিন্তু অন্তরে অন্তরে জীবমানব বিশ্বমানবে প্রসারিত, সেইদিকে সে সুখ চায় না, সে সুখের বেশি চায়, সে ভূমাকে চায়। তাই সকল জীবের মধ্যে মানুষই কেবল অমিতাচারী। তাকে পেতে হবে অমিত, তাকে দিতে হবে অমিত। কেননা, তার মধ্যে আছে অমিত মানব। সেই অমিত মানব সুখের কাঙাল নয়, দুঃখভীরু নয়। সেই অমিত মানব আরামের দ্বার ভেঙে কেবলই মানুষকে বের করে নিয়ে চলেছে কঠোর অধ্যবসায়ে। * * *

"উপনিষদে ভগবান সম্বন্ধে একটি প্রশ্নোত্তর আছে। স ভগবঃ কস্মিন প্রতিষ্ঠিতঃ, সেই ভগবান কোথায় প্রতিষ্ঠিত? এই প্রশ্নের উত্তর, স্বে মহিম্নি। নিজের মহিমায়। সেই মহিমাই তাঁর স্বভাব। সেই স্বভাবেই তিনি আনন্দিত। মানুষেরও আনন্দ মহিমায়। তাই বলা হয়েছে, ভূমৈব সুখং। কিন্তু যে স্বভাবে তার মহিমা, সেই স্বভাবকে সে পায় বিরোধের ভিতর দিয়ে, পরম সুখকে পায় পরম দুঃখে। মানুষের সহজ অবস্থা ও স্বভাবের মধ্যে নিত্যই দ্বন্দ্ব। তাই ধর্মের পথকে অর্থাৎ মানুষের পরম স্বভাবের পথকে দুর্গং পথস্তৎ কবয়োবদন্তি।"[১]

গদ্যকবিতার মত অপরূপ ছন্দোময় ভাষায় লেখা এই প্রবন্ধটি।

[১] "মানুষের ধর্ম"।

মহাকবি আবৃত্তির ভঙ্গীতে সুর করে পড়ছিলেন। বাঁশির মত গলার স্বর এতদিন বইয়ে পড়তুম, সেদিনের সভায় জীবনে প্রথম সেই সুরলোকের কণ্ঠস্বর কানে শুনেছিলুম। সে স্বর পুরুষালী ছিল না। তবু তার মধ্যে বজ্রের তেজ ছিল, আর ছিল মন-ভুলানো মধুরতা। কানের ভিতর দিয়ে তা গিয়ে মর্মের মণিকোঠায় পৌঁছল। কি যে বুঝলুম, জানি না। আজ মনেও নেই। শুধু মনে আছে, ভাষণ শুনতে শুনতে সেদিন আমি একেবারে তন্ময় হয়ে পড়েছিলুম।

মহাকবি "এবার ফিরাও মোরে" কবিতাটির অংশ বিশেষ আবৃত্তি করে ভাষণ শেষ করলেন। তারপর মনে হল, দু-তিন মিনিট ধরে তাঁর তেজোদীপ্ত, সুরেলা কণ্ঠস্বর যেন হলের চারপাশে ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে। শ্রোতারা এমন ভাবাচ্ছন্ন হয়ে বসেছিলেন যে, বক্তার ভাষণ কখন শেষ হয়েছে, তা অনেকে বুঝতে পারেন নি। তাঁরা এসেছিলেন, মানুষের ধর্ম কি তা বুঝতে। তাঁরা ফিরে গেলেন কি এক অজানা আকর্ষণে অভিভূত হয়ে।

সেদিন মহাকবিকে প্রাণভরে দেখলুম। কিন্তু দশের হাটের মধ্যে তাঁকে কাছে পেয়ে আশা আমার মিটল না। বোধ হল, এ পাওয়া ত সত্যিকার পাওয়া নয়। ফলে আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ল, আমার মনে তাঁর সান্নিধ্য লাভের আকাঙ্ক্ষা আরও বেড়ে গেল।

দিন কেটে যায়। ক্রমে বছর শেষ হতে চলল। এই সময়ে ঠিক হল, ১৯৩৩ সালের ডিসেম্বর মাসে কোন্নগর গ্রামে হুগলী জেলা সাহিত্যসম্মেলনের প্রথম অধিবেশন ডাকা হবে। উদ্যোক্তা "কোন্নগর পাঠচক্রের" সভ্যেরা।

আমি আগে থেকেই পাঠচক্রের সম্পাদক ছিলুম। আমাকে এই সম্মেলন-কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত করা হল। সম্মেলনের কাজে উৎসাহভরে লাগলুম। শরৎচন্দ্র সভাচার্য হতে রাজী হলেন। কিন্তু সম্মেলনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগ না ঘটাতে পারলে ত শান্তি নেই! যথাসাধ্য চেষ্টা চলল।

তবু শেষ পর্যন্ত গোপন বাসনা মিটল না। মহাকবির শরীর তখন ভাল যাচ্ছিল না। তাই সম্মেলনের অধিবেশনে পড়ার জন্য তাঁর লেখা একটি প্রবন্ধ পাওয়া গেল, কিন্তু দেখা পাবার সুযোগ ঘটল না।

১৯৩৬ সালের কথা। আমার সেজ ভাই ডঃ বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় তখন লণ্ডনে। কলকাতায় তাঁর ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীটের বাসায় একলা থাকি। দিন কয়েক হল এম-এ পরীক্ষা শেষ হয়েছে। মনে করছি, কোন কাজে লাগবার আগে সারা ভারতবর্ষটা ঘুরে দেখবার জন্য বেরিয়ে পড়ব। কারোকে কিছু না জানিয়ে গোপনে চলছে তার আয়োজন।

এমন সময় দাদার বন্ধু এসে খবর দিলেন, শান্তিনিকেতনে একটি চাকরি খালি আছে। বাংলাসাহিত্যের অধ্যাপকের চাকরি। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যরসিক ভাল লোক খুঁজছেন। আপনি কেন চেষ্টা করুন না?

প্রস্তাবটি শুনে মনে খুব উৎসাহ অনুভব করলুম না। সবিনয়ে বললুম, এখন চাকরি করার ইচ্ছে নেই।

পাশে একজন কবি-বন্ধু বসেছিলেন। তিনি অন্তর্মুখী চিন্তার ভঙ্গীতে বললেন, ভারতবর্ষ বিচিত্র দেশ। তা ঘুরে ঘুরে দেখার মধ্যে আছে যেমন মজা, তেমনি অবশ্য আছে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভের সম্ভাবনা। তবু বলব, রবীন্দ্রনাথের মত মহাপুরুষের সান্নিধ্যে থেকে যদি তাঁকে দেখার সুযোগ পাওয়া যায়, এই ভারতবর্ষ না দেখতে পেলেও জীবনে তোমার খুব ক্ষতি হবে না।

চমকে উঠলুম। বিষয়টাকে ত এমন করে ভেবে দেখিনি!

অচিরে মন স্থির করে শান্তিনিকেতনের উদ্দেশে যাত্রা করলুম।

তখন রাত হয়ে গেছে, বোলপুর স্টেশনে পৌঁছলুম। বিশ্বভারতীর নিজস্ব বাস যাত্রীদের নিয়ে যাবার জন্য বাইরে অপেক্ষা করছিল। কিছুক্ষণ পরে সেই বাসে করে এসে পৌঁছলুম শান্তিনিকেতনের

অতিথিশালায় (গেস্ট হাউস)। এই বাড়িখানিই ওখানকার সব চেয়ে পুরাতন বাড়ি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বাড়িটি তৈরী করিয়ে-ছিলেন। তিনি এখানে এসে মাঝে মাঝে থাকতেন। বাড়িটির অবস্থা জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছিল। তাকে এতদিন আর মাটির উপরে দাঁড়িয়ে থাকতে হত না, যদি না চারিদিকে লোহার পাত দিয়ে তার কমজোরী দেওয়ালগুলোকে এঁটে বেঁধে রাখা হত।

শ্রীকৃষ্ণ কৃপালনী কিছুদিন আগে রবীন্দ্রনাথের নাতনী শ্রীমতী নন্দিতা দেবীকে বিয়ে করেছিলেন। আমি তাঁর নামে সুপারিশ চিঠি নিয়ে গেছলুম। সকালে শ্রীকৃপালনীর সঙ্গে দেখা করলুম। তিনি 'মালঞ্চ'-এ থাকতেন।

তাঁর সঙ্গে অল্প পরিচয় ছিল। তিনি দাদার কলকাতার বাসায় অধ্যাপক নির্মল বসুর অতিথি হয়ে কয়েকদিন কাটিয়ে গেছলেন। আমার প্রস্তাব শুনে বললেন, একটা কাজে আমি এখনই উত্তরায়ণে যাচ্ছি। আজ সকালেই যাতে কবির সঙ্গে আপনার দেখা হয়, তার চেষ্টা করব। আপনি ঘণ্টাদেড়েক পরে আবার আসুন। তবে একটা কথা। বোধহয় জানেন না, শান্তিনিকেতনে দলাদলি আছে। এখানকার মাইনেও খুব কম। আপনি কি এ চাকরি করতে পারবেন?

আমি তাঁকে আমার সংকল্পের দৃঢ়তার কথা জানালুম। তারপর দিনের আলোয় শান্তিনিকেতন আশ্রম ঘুরে দেখবার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লুম। আমার মনে ছিল তীব্র ঔৎসুক্য।

ঘুরে ঘুরে দেখলুম বিদ্যাভবন, কলাভবন। দেখলুম, ছাত্রীদের থাকবার শ্রীভবন, সভাসমিতির হলঘর সিংহসদন—আরও কত কি। বাড়িগুলি দেখতে কলকাতার ঘরবাড়ির চেয়ে একেবারে অন্যরকম। মাঝে মাঝে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। শ্রীভবনের দক্ষিণ দিকে বিরাট খেলার ময়দান। এপাশে ওপাশে চলে গেছে কাঁকর বিছানো রাঙামাটির পথ,—পরিষ্কার, প্রশস্ত, ছায়াসুশীতল। পথের দুধারে আছে তরু-শ্রেণী—আমলকি, মহুয়া বা শাল। কোথাও বা শিউলি অথবা

জবা গাছের সারি। পথে পথে ছাত্রছাত্রীরা অবাধে ঘোরাফেরা করছে। তাদের মুখে আছে যেন এক ঝলক স্বাধীনতার দীপ্তি। দেখে চোখ জুড়ল। বোধ হল, এদের জীবন আঁট-সাঁট ডিসিপ্লিনের ভারে পঙ্গু নয়। এদের হাসিখুসী মুখ, অজানা অতিথির সঙ্গে ব্যবহার অসংকোচ। ভাল লাগল এদের আনন্দভরা জীবনচর্যা।

কিন্তু সব চেয়ে ভাল লাগল শান্তিনিকেতনের মুক্ত প্রকৃতি। মনে হল, ফাঁকা মাঠ আর খোলা আকাশ যেন জীবনে আর কখন এমন করে চোখে পড়েনি। কলকাতায় প্রকৃতি থাকে সংকোচে জড়সড়। চোখে পড়লেও মনে তার ছায়া পড়ে না। আমার জন্মভূমি যে ছোট শহরে, সেখানে অবশ্য প্রকৃতির রূপ মহানগরীর প্রকৃতির মত প্রচ্ছন্ন নয়। তবু সেখানকার আকাশবাতাসও শহরবাসীর দৈনন্দিন জীবনে কোন সাড়া জাগাতে পারে না।

শান্তিনিকেতনের প্রকৃতির যেন আছে নিজস্ব একটি ব্যক্তিত্ব। তাকে উপেক্ষা করা কোন আশ্রম অতিথির পক্ষেই সম্ভব নয়। তার সংস্পর্শ চকিতে আমাদের ঘুমন্ত মনকে জাগিয়ে দেয়। কলকাতার নাগরিক জীবনের প্রধান প্রধান সুবিধাগুলি সবই এখানে আছে। বিজলী আলো, পাইপ জল আর টেলিফোন। কিন্তু তারা যেন প্রকৃতির অঙ্গ হয়ে মিশে আছে। তাদের উদ্ধত আড়ম্বরে ঢাকা পড়েনি আশ্রম প্রকৃতির সহজ রূপ।

বাংলাদেশের রাজধানী থেকে মাত্র এক শ মাইল দূরে শান্তি-নিকেতন। কিন্তু ভৌগলিক নিকটতা সব সময়ে অন্তরের অন্তরঙ্গ-তার পরিচয় দেয় না। তাই স্বভাবে শান্তিনিকেতন কলকাতা থেকে রয়েছে বহুদূরে। মহাকবির সৃষ্টিকরা বিদ্যাপুরীরর সঙ্গে ইংরেজ বণিক-রাজের প্রয়োজনে-গড়া রাজপুরীর অমিল যেন আকাশ-পাতালের।

ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে আমার মনে হল, শান্তিনিকেতনের আকৃতি ও প্রকৃতি আমাদের পরিচিত জগতের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা।

এখানে এসে হাজির হলে ভিতরে জাগে এক অজানা অনুভূতি। বোধ হয়, যেন পুরাকালের পুষ্পক রথে চড়ে বায়ুমণ্ডলের পারে অন্য গ্রহে এসে পৌঁচেছি। স্বপ্নে ও বাস্তবে রচা অপূর্ব এই বিংশ শতাব্দীর অলকাপুরী।

*

* *

শান্তিনিকেতন আশ্রম দেখা শেষ হলে ফিরে এলুম মালঞ্চ ভবনে। শ্রীকৃপালনী অধ্যাপক অনিল চন্দের সঙ্গে গল্প করছিলেন। শ্রীচন্দ তখন মহাকবির সেক্রেটারী। পরিচয়ের পরে তিনি আমাকে বললেন, চলুন। গুরুদেব আপনাকে দেখতে চেয়েছেন। "বিচিত্রা"র সম্পাদক উপেনবাবুর সঙ্গে আপনার জানাশোনা আছে?

উত্তর দিলুম, হ্যাঁ, জানাশোনা আছে। কেন বলুন ত?

শ্রীচন্দ হাসতে হাসতে বললেন, কিছুক্ষণ আগে চিঠির ডাক এসেছে। তাতে উপেনবাবুর একখানা চিঠি পাওয়া গেল। তিনি আপনার সম্বন্ধে খুব প্রশংসা করে লিখেছেন। গুরুদেব চিঠি পড়ে খুসী হয়ে আপনাকে দেখতে চেয়েছেন। তা না হলে আমাদের ত লোক প্রায় ঠিক হয়েই গেছল।

শ্রীচন্দের সঙ্গে মালঞ্চের বাগান পার হয়ে উত্তরায়ণের পিছনের বাগানে এসে পৌঁছলুম। এ হচ্ছে খিড়কির পথ, সদরের সড়ক নয়। ছু-একটি পরিচ্ছন্ন ফুলের বাগান এবং সবজির ক্ষেতের পাশ দিয়ে এগিয়ে চললুম। এক জায়গায় একটি ছোট কৃত্রিম সরোবর তৈরী হচ্ছিল। ভাবতে ভাবতে চলেছি, এখানে পথে ঘাটে বাড়িতে বাগানে রয়েছে রুচির পরিচয়। আর সে রুচি বারোয়ারী নয়, পাঁচজনের নয়। তা স্বতন্ত্রতায় অভিনব।

ক্রমে হাজির হলুম একটি পাঁচিল-ঘেরা বাগানে। তার চারিদিকে পরিপাটি করে সাজানো ফুলের টব আর পাথরের মূর্তি, ঝকঝকে, তকতকে। বাগানের ছোট দরজা পার হতেই হঠাৎ চোখে

পড়ল, উদয়নএর দক্ষিণের বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে রয়েছেন মহাকবি।

তাঁর গায়ে ছিল শাদা পাজামার উপর শাদা জোব্বা, ঢলঢলে, ধবধবে। লাল কাঁকর-ভরা পথে আমাদের চলার খসখস শব্দ হয়ত আগেই তাঁর কানে গেছল। তিনি যেন ধ্যানে নিস্তব্ধ হয়েছিলেন। চোখ দুটিতে স্থির, ঊর্ধ্ব দৃষ্টি।

আমি অকস্মাৎ এইভাবে এত কাছে মহাকবিকে দেখতে পাব, আশা করি নি। এই অবস্থার জন্য আমার মন প্রস্তুত ছিল না। মনে পড়ে, কি বিস্ময়ভরা চোখে সেদিন মহাকবির দিকে প্রথম তাকিয়েছিলুম। কিছুক্ষণের জন্য দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরাতে পারিনি।

প্রণাম করে দাঁড়ালুম। মহাকবি চোখ ফেলে একবার আমার সর্বাঙ্গ দেখে নিলেন। তারপর ইঙ্গিতে সামনের মোড়াতে বসতে বলে জিজ্ঞাসা করলেন, কই গো, তোমাকে ত কোথাও দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না ?

আমি জবাব দিলুম, আজ্ঞে না। কোনদিন আপনার কাছে এসে প্রণাম করবার মত দুঃসাহস আমার হয় নি। দূর থেকেই প্রণাম করে চলে গেছি। মহাকবি হাসতে হাসতে বললেন, ওঃ, তাহলে তোমাকে আমি না চিনলেও তুমি আমাকে চেন, দেখছি।

তাঁর কথা শুনে হেসে উঠলুম।

তিনি প্রসঙ্গান্তরে যাবার জন্য জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের জায়গা ঘুরে ঘুরে দেখলে ?

শান্তিনিকেতন আশ্রম সম্বন্ধে মন তখন আবেগে ভরপুর। আপনা থেকে আমার মুখ দিয়ে উত্তর বের হল, আজ্ঞে হ্যাঁ। শহর থেকে এসে মনে হচ্ছে যেন, একেবারে অন্য কোন রাজ্যে এসেছি। খুব ভাল লাগল।

মহাকবি আমার উত্তর শুনে খুশী হলেন। বলতে লাগলেন,

ভাল ত লাগবারই কথা। দেখ, যাঁদের চোখে শান্তিনিকেতন ভাল লাগে না, তাঁদের বিশেষ শ্রদ্ধা করতে পারি না।

কথা বলতে বলতে তিনি অনেকটা সহজ হয়ে এসেছেন। তাঁর মূর্তির ধ্যান-ভাব কেটে গেছে। আমি সাহস করে বললুম, এখানে এসে আজ সকাল থেকে কেবলই ভাবছি, মানুষ কলকাতার ধূলো-ধোঁয়া আর হট্টগোল নিয়ে কেমন করে সেখানে বাস করে!

মুখে তাঁর প্রসন্নতার হাসি ফুটে উঠল। তিনি হয়ত আমার কাছে মহানগরীর প্রশংসাই স্বাভাবিকভাবে আশা করেছিলেন। উত্তর দিলেন, ঠিক বলেছ। কলকাতা ত দিন দিন বাসের অযোগ্য হয়ে পড়ছে। আমি ওখানে গিয়ে একদিনও থাকতে পারি না। যেন হাঁফ ধরে। আমি খোলা আকাশের ভক্ত কি না।

প্রথম বিস্ময়ের বিহ্বলতা একটু কেটে গেলে বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে কবিকে দেখতে লাগলুম। তাঁর চুল ও দাড়ির বিশেষত্ব হচ্ছে, তা শুধু ধবধবে, চকচকে নয়; তা রেশমী, পরিষ্কার ও মসৃণ। কথা বলার সময় তাঁর সুডোল, প্রশস্ত ললাটে চিন্তার গভীর রেখা পড়ে। ভ্রূর শেষে কপালের শেষ প্রান্ত দুটি একটু চাপা। হয়ত বার্ধক্যের দরুন। চোখদুটি বিশাল নয়,—আয়ত দেবচক্ষুর মত। খানিকটা স্বাভাবিক নিমিলিত ভাব। চোখের তারায় প্রখর দীপ্তি অথচ তার মধ্যে আছে আত্মসমাহিত অন্তর্মুখিনতা। কান দুটি মুখের অন্যান্য অংশের তুলনায় বড় এবং স্থূলতায় ভারী। নাকটি দীর্ঘ, প্রসারিত, ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক। কিন্তু আমরা যাকে বাঁশির মত নাক বলি, তেমন নয়। হাতের আঙুলগুলি মোটা-মোটা, মাথার দিকে অল্প ছুঁচালো। মনে হয়, আঙুলের গড়ন নিছক শিল্পী প্রকৃতির নয়, মিশ্র প্রকৃতির। সুঠাম, আজানুলম্বিত, বলিষ্ঠ তাঁর বাহু দুটি। তাঁর জামার গলার বোতাম খোলা ছিল। ঘাড়ের দুপাশের সীমান্তে অপরূপ বাঁকা রেখার সৌন্দর্য দেখা যাচ্ছিল। তাঁর হাতে, মুখে,

চোখে, সর্বাঙ্গে আছে যেন কোন মূর্তিকারের সযত্নে-আঁকা, তীক্ষ্ণ, স্পষ্ট (sharp) সীমান্ত রেখা।

দূর থেকে রবীন্দ্রনাথের ছবি দেখে মনে হত, তাঁর মুখখানি বুদ্ধের প্রশান্ত লালিমায় অপরূপ। কিন্তু আজ কাছে গিয়ে লক্ষ করলুম, তাঁর মুখের দিকে দিকে ব্যাপ্ত হয়ে আছে প্রশান্তির গরিমার চেয়েও বিশাল ব্যক্তিত্বের দীপ্তি এবং তেজ। মনে হল, তাঁর বাইরের রূপ অপরূপ হয়ে উঠেছে তাঁর অন্তরের ব্যক্তি-সত্তার সৌন্দর্যে। তিনি যে কোথাও সাধারণ নন, তিনি যে অপর দশজনের একজন নন, তিনি যে অসামান্য, তা তাঁর চোখে, মুখে, অঙ্গে অঙ্গে সুপরিস্ফুট। শুধু দেহে কেন, চলনে, বলনে, আচারে ব্যবহারে, বেশভূষায়— কোথাও তিনি নিজেকে বেমানান করে ফেলেন না। মানুষের দেশে তিনি জন্মেছেন রাজার আকৃতি ও মহানায়কের প্রতিভা নিয়ে। তাই পৃথিবীর দিকে দিকে অধিকার করেছেন মানুষের হৃদয়ের রাজাসন।

ইতিমধ্যে কয়েকটি ব্যক্তিগত প্রশ্নোত্তরের পালা শেষ হল। তারপর মহাকবি জিজ্ঞাসা করলেন, আমি অভিনয় করি কি না?

পাশ থেকে তাঁর একজন অন্তরঙ্গ মন্তব্য করলেন, একবার "রাজা ও রানী" অভিনয় করলে বেশ হয়, গুরুদেব।

মহাকবি হেসে বললেন, না, না। "রাজা ও রানী" আর নয়। "তপতী" নাটক রচনার পর ওর আর বিশেষ দাম নেই।

কিছুদিন আগে বিচিত্রা পত্রিকায় আমার লেখা "তপতী" নাটকের আলোচনা[১] প্রকাশিত হয়েছিল। হঠাৎ অপ্রত্যাশিত-ভাবে আমার পাণ্ডিত্য প্রচার করার সুযোগ পেলুম। বললুম, "তপতী"র প্লটে নাটকীয় বস্তু অনেক বেশী আছে বলে মনে হয়। এর মধ্যে নাটকের দ্বন্দ্বটা খুবই তীক্ষ্ণ। তবে সে দ্বন্দ্ব ভিতরের দ্বন্দ্ব,

১ "বিচিত্রা", ফাল্গুন, ১৩৩৮।

বাইরের নয়। "রাজা ও রানী"তে আছে খুব বেশী বাইরের অ্যাকশন, সাধারণ দর্শকের কাছে তাই তার অভিনয় হয় জমজমাটে।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, হ্যাঁ। "রাজা ও রানী" বইখানা মেলো-ড্রামাটিক হয়ে গেছে। আমার অল্প বয়সের লেখা। ওর মধ্যে নাটকীয় দ্বন্দ্ব তেমন ফুটে ওঠে নি।

আমি সাহস পেয়ে আরও বললুম, শুনেছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কোন অধ্যাপকের মত কিন্তু একেবারে উলটো। তাঁরা ভাবেন, "রাজা ও রানী" নাটক বেশ ভাল নাটক। আর "তপতী"র মধ্যে আপনি তত্ত্বকথা চমৎকার ভাষায় পাত্রপাত্রীদের মুখ দিয়ে প্রকাশ করেছেন মাত্র, তা অভিনয় করতে গিয়ে নাকি কোন তীক্ষ্ণ দ্বন্দ্ব ফুটিয়ে তোলা যায় না। অর্থাৎ "তপতী" নাটক হচ্ছে কলেজের ক্লাসের জন্য, মঞ্চের জন্য নয়।

একটু থেমে আমার বক্তব্য শেষ করলুম, আমার মনে হয়, কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁরা সাহিত্য পড়ান, তাঁদের অনেকের মধ্যে নাটক, উপন্যাস, লিরিক কবিতার প্রধান প্রধান গুণ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট বোধ নেই।

তিনি জিজ্ঞাসু চোখে আমার দিকে তাকালেন। আমি তাঁর এই ভঙ্গীর মধ্যে অপ্রত্যক্ষ সম্মতির ইঙ্গিত পেয়ে আবার শুরু করলুম, বাংলাসাহিত্যে আপনি যেমন ছোটগল্প প্রথম সৃষ্টি করেছেন, তেমনি মনে হয়, এক নতুন ধরনের নাটকও সৃষ্টি করেছেন। "তপতী" তার দৃষ্টান্ত। এই শ্রেণীর নাটককে নাম দেওয়া কি যেতে পারবে অন্তর্দ্বন্দ্বমূলক নাটক? আমি মেটারলিংকের লেখা "মেরী ম্যাগ-ডালিন" নাটকটি পড়েছি। তা পড়ে মনে হয়, তাতে ফোটানো হয়েছে মেরীর মনের তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব। বাইরের অ্যাকশানে তা বেশী ফোটানো যায় না। তাই বইখানিতে সাধারণ নাটকের মত জম-জমাটে অ্যাকশান নেই। "তপতী" নাটক সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই বলা যায়। এ শেকস্‌পীয়র বা ইবসেনের নাটকের ধারায় ঠিক

লেখা নয়। আজকের যুগ বুঝতে পেরেছে, মানুষের সূক্ষ্ম মন এক অদ্ভুত অন্তর্দ্বন্দ্বের রত্নখনি। সে দ্বন্দ্ব শুধু ক্ষণিকের বাহ্য অ্যাকশানে বা সংঘাতমূলক পরিবেশ সৃষ্টি করে প্রকাশ করলে তার মহিমা ভাল-ভাবে ফুটিয়ে তোলা যায় না। সে শুধু দর্শকদের মৌখিক বাহবার জিনিস নয়, তা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করার জিনিস।

আমার কথা শুনতে শুনতে তিনি যেন একটু তন্ময় হয়ে গেলেন। আমি কথা আর না বাড়িয়ে হঠাৎ চুপ করে গেলুম।

তিনি আমার পূর্বকথার সূত্র ধরে বলতে লাগলেন, নাটক, উপন্যাস, গীতিকবিতা সম্বন্ধে আমাদের দেশে খুব কম লোকেরই সুস্পষ্ট ধারণা আছে। আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে দাসত্ব নিয়েছিলাম, তখন ইচ্ছে হয়েছিল, নাটক কি, উপন্যাস কি—এই সব বিষয়ে আলোচনা করে বই লিখব। কিন্তু—

রবীন্দ্রনাথ রহস্য ছলে হাসতে হাসতে মন্তব্য করলেন, তার আগেই বিদায় নেবার সময় এল। দেখ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ওঁদের মধ্যে একটা আদর্শ নিয়ে কাজ করে যাবার অভ্যাস অনেকেরই নেই। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যাসাধনার নানা ক্ষেত্রে এর কাজ প্রসারিত হোক। এর গৌরব বাড়ুক। আমাদের কঠোর পরিশ্রমের ফলে দেশে দেশে এর সম্মান ছড়িয়ে পড়ুক। এ রকম আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে এক আশুতোষই কাজ করতেন। আর আজকাল শ্যামাপ্রসাদ করছেন। কিন্তু শুধু উপর থেকে দু-একজনের চেষ্টায় হবে না। আরও অনেক আদর্শবাদী লোককে কাজ করতে হবে।

মহাকবি স্মৃতি-অবগাহনের ভঙ্গীতে বলে যান, ওঁরা এমন যে, আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে দাসত্ব শুরু করলাম, তখন কেউ কেউ আমাকে বললেন, আপনাকে বেশী কিছু করতে হবে না। মাঝে মাঝে ক্লাস নিয়ে যাহোক কিছু বলে সেরে দেবেন। এই ত এঁদের কাজের আদর্শ! এঁরা কাজ চান না। আমার নাম আছে, তাই তা যোগ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শোভা বৃদ্ধি করলেন।

ক্রমশঃ তিনি প্রসঙ্গান্তরে চলে গেলেন। কথা বলতে বলতে মহাকবির কণ্ঠ চড়ে উঠল। স্পষ্ট, মধুর, তীক্ষ্ণ সেই স্বর। এতক্ষণ হাত দুখানি জোড় করে কোলের উপর রেখে কথা বলছিলেন। এবার তিনি কথার যতির সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতখানি প্রাচীন ঋষিদের মত তুলতে নামাতে লাগলেন। মাঝে মাঝে হাত তোলার সঙ্গে সঙ্গে ঢলঢলে জামার হাতা অল্প অল্প সরে যেতে লাগল। সেই সুযোগে তাঁর দীর্ঘ বাহুর অনেকখানি দেখা গেল। লক্ষ করলুম, পঁচাত্তর বছর বয়সেও তাঁর হাতের উপরভাগের মসৃণ ত্বকে কোথাও জরার চিহ্ন পড়েনি। তা আজও দীপ্তিতে উজ্জ্বল।

রবীন্দ্রনাথ বলতে লাগলেন, সাহিত্যসেবা করতে করতে এক সময় আমার অন্তরের মধ্যে একটা প্রেরণা জেগে ওঠে। নূতন একটা কর্মের তাগিদ অনুভব করি। সে তাগিদ হচ্ছে, শিক্ষার ভিতর দিয়ে সমগ্র দেশের সেবা করা। আমার সম্বল বেশী ছিল না। অভিজ্ঞতা ত কিছুই ছিল না। তবু কাজ আরম্ভ করে দিলাম। আমার কবিমন এই নতুন প্রেরণায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। প্রথমে পাঁচ সাতটি ছাত্র নিয়ে যে ব্রতের শুরু হয়েছিল, আজ তা বিশ্বভারতীতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু একাজ একার নয়। একে গড়ে তুলতে হলে বহু লোকের প্রয়োজন। এই কর্মানুষ্ঠানে আমার যথা-সাধ্য আমি দিয়েছি, আমার কাজ আমি শেষ করেছি। এখন তোমরা এস। এ দায়িত্ব যে কত বড় গুরুতর, তা অনুভব কর। এই শিক্ষাব্রতে যোগ দাও। আজ তোমাদের উপর এর সবকিছু নির্ভর করছে।

আবেগের সঙ্গে কথা বলতে বলতে মহাকবির চোখ দুটি আধ-নিমীলিত হয়ে এল।

*

* *

সেদিন মহাকবিকে প্রণাম করে যখন বিদায় নিলুম, তখন আমার মন আবেগে বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। কানের ভিতরে

তখনও বাজছিল তাঁর মর্মস্পর্শী কণ্ঠস্বরের ধ্বনি। বই আমাকে মুগ্ধ করে সত্যি, কিন্তু চিরদিন মানুষে আমার বেশী অনুরাগ।

ইংলণ্ডের রোমাণ্টিক কবি জন কীট্‌স। তিনি যেদিন মহাকবি হোমারের লেখা কাব্য প্রথম পড়েন, সেদিন নিবিড় বিস্ময়ের বিহ্বলতায় তাঁর মনপ্রাণ ভরে গেছল। মহামানুষ রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে প্রথম এসে আমার মনের অবস্থাও ঠিক তেমনি হয়ে উঠল। কীট্‌সের কথায় বলি ঃ

"তখন আমার হৃদয় ভরে ডেকে উঠেছিল
সেই রহস্য-নিবিড় বিস্ময়ের বন্যা,
যেমন আকাশ-বিজ্ঞানীর বুকে জাগে,
যখন তাঁর দৃষ্টিপথে হঠাৎ ভেসে ওঠে
একটি নতুন তারার ক্ষীণ আলো।
অথবা আমেরিকা সন্ধানের যাত্রাশেষে
বীর করটেজের শ্যেনচক্ষে
ঘনিয়ে উঠেছিল যে নীরব নিবিড়তা—
যখন ডেরিয়েনের পাহাড়চূড়া থেকে
অকস্মাৎ দেখা গিয়েছিল
প্রশান্ত মহাসাগরের দূর দিগন্তরেখা।
—তাঁর সহচরেরা তখন
পরস্পরের দিকে বোবা চোখে তাকাচ্ছিল
উদ্ভট কল্পনায়।"[১]

১ "Then felt I like some watcher of the skies
When a new planet swims into his ken ;
Or like stout Cortez when with eagle eyes
He star'd at the Pacific—and all his men
Looked at each other with a wild surmise
Silent, upon a peak in Darien."

॥ দুই ॥

তারপর শুরু হল আমার শান্তিনিকেতন-বাস।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রসান্নিধ্যে বাস করার ফলে যা সব চেয়ে আগে আমার চোখে পড়েছিল, তা হচ্ছে থাকাখাওয়া সম্বন্ধে তাঁর বৈশিষ্ট্য। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ হচ্ছেন দুর্লভ রুচির মানুষ।

স্বীকার করি, থাকা সম্বন্ধে রুচিবান মানুষ বাঙলাদেশে আরও আছেন। কিন্তু মহাকবির রুচি এত সূক্ষ্ম ও বিপ্লবকর, যে এদিক থেকে তিনি একেবারে একক। তাঁর সমতুল্য কেউ আছেন কিনা, জানিনা।

তিনি শান্তিনিকেতনে বাস করেন 'উত্তরায়ণ' ভবনে। 'উত্তরায়ণ' ঠিক একটি ভবন নয়। শান্তিনিকেতন আশ্রমের উত্তর দিকে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ বিঘার একটি এলাকা। তার ভিতরে ছড়িয়ে আছে কতকগুলি বাড়ি আর বাগান সরোবর। তাদের সমষ্টিগত নাম 'উত্তরায়ণ'।

সেই বাড়িগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় বাড়িটির নাম উদয়ন। তিন-তলা সেই ভবনটি। এককালে একসঙ্গে তৈরী হয় নি। বারবার নানা-ছন্দে নানাভাবে প্রথম পরিকল্পনার ইঁটকাঠের রচনাটি পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়েছে। তবু বাইরে থেকে প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, যেন কালিদাসের কালের উজ্জয়িনীর কোন মনোরম অট্টালিকা। এর বৈঠকখানা সদাই সুচারুরূপে সজ্জিত থাকে। দেওয়ালে সেগুন কাঠের সুন্দর ফ্রেমের মধ্যে মহাকবির আঁকা নানা ছবি। আসবাবপত্র প্রাচীন ভারতীয় ধরনের আকারে বিশেষ পরিকল্পনায় তৈরী-করা। দরজায় দরজায় সিন্ধুদেশের উজ্জ্বল রং ও চুমকির কাজ-করা, আড়ম্বর-ভরা পরদা। ঝকঝকে তামার তৈরী নানা আকারের ঘটে রজনীগন্ধার গুচ্ছ। প্রাসাদের পূবদিকে চওড়া লালমাটির পথের ধারে আছে বড় গোলাপ বাগ।

কিন্তু মহাকবি 'উদয়ন' প্রাসাদে বাস করতে ভালবাসেন না। সেখানে সপরিবারে বাস করেন শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মহাকবি সাধারণতঃ থাকেন 'উত্তরায়ণে'র একেবারে উত্তর প্রান্তের দুখানি ছোট বাড়িতে। একটির নাম 'শ্যামলী', আর একটি 'পুনশ্চ'। 'শ্যামলী' পুরোপুরি মাটির তৈরী বাড়ি। তার ছাদ পর্যন্ত মাটির। শোনা যায়, পারস্যদেশে এমনি বাড়ি দেখে এসে তিনি কয়েক বছর আগে 'শ্যামলী' তৈরী করিয়েছিলেন। কিন্তু অল্প বৃষ্টির মুল্লুক ইরানে যা সম্ভব, খর বর্ষার দেশ বাঙলায় তা সম্ভব হয় নি। বর্ষার দাপট সহ্য করতে না পেরে মাটির ছাদ জখম হয়েছে, দেওয়াল জায়গায় জায়গায় ধ্বসে গেছে। তাই 'শ্যামলী'র পাশে নতুন বাড়ি উঠেছে, নাম 'পুনশ্চ'। ছাদ পাকা, দেওয়াল অংশতঃ মাটির। এদের পাশে পশ্চিম কোণে আর একটি পুরাতন ছোট বাড়ি আছে, নাম 'কোণার্ক'। মহাকবি এই বাড়িতেও অনেকদিন বাস করেছেন। এখন তাঁর সেক্রেটারী সপরিবারে সেখানে থাকেন।

বাড়িগুলির গড়ন এবং পরিমণ্ডল দেখে মহাকবির মনের কিছু কিছু গোপন পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রত্যেক বাড়িতে আছে মাত্র দু-তিনখানি ছোট ছোট একতলা ঘর। সেই ঘরগুলির তিন দিক ঘিরে আছে প্রশস্ত বারান্দা। বারান্দাগুলি পুরোপুরি খোলা নয়। বড় বড় কাচের শাসিওয়ালা জানালা দিয়ে বন্ধ-করা। জানালাগুলি এত বড় এবং এত কাছাকাছি বসানো যে বারান্দায় বসে বহুদূরের দিগন্ত চোখে পড়ে।

মহাকবি বাড়িতে বসে বসে নিত্য দেখতে পান শান্তিনিকেতনের সকালসাঁঝের আকাশে ভোরের আলোর মেলা আর গোধূলির দোল খেলা। একটু দূরে দিগন্তবিস্তৃত রাঙা কাঁকর মাটির খোয়াই। বর্ষার জল যে মাটির গায়ে ভাঙন ধরিয়ে কত অপরূপ দৃশ্য সৃষ্টি করতে পারে, তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। মহাকবির ভাষায় বলতে হয়,

"মাটি গেছে ক্ষয়ে,
দেখা দিয়েছে
ঊর্মিল লাল কাঁকরের নিস্তব্ধ তোলপাড়।"

বাড়িগুলির প্রত্যেকটির সামনে আছে বাঁধানো, চওড়া চাতাল। রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই সকালবেলা সেখানে মুক্ত আকাশের নীচে বসে কাজ করেন। আর সন্ধ্যাবেলা অন্তরঙ্গদের নিয়ে সেখানে বসে আলাপ-আলোচনা করেন। দিনের বাকী সময়টা ভিতরের বারান্দায় বসে বসে চলে তাঁর লেখাপড়া, ছবিআঁকা অতিথিদের সঙ্গে দেখাশোনার কাজ। সামনে থাকে একটি ছোট সাধারণ টেবিল। পাশে ছু-চারটি মোড়া বা ঐ জাতীয় চেয়ার।

সাধারণতঃ, তাঁর ভাল লাগে না বড় বড় ঘর, প্রয়োজনের অতিরিক্ত আসবাবপত্র বা জাঁকজমকভরা সাজসজ্জা। তিনি নিজেই লিখেছেন, "ছোটঘর আমি ভালবাসি। ঘরটাই যদি বড় হয়, তবে বাহিরটা থেকে দূরে পড়া যায়। বস্তুতঃ বড় ঘরেই মানুষকে বেশী আবদ্ধ করে, তার মধ্যেই তার মনটা আসন ছড়িয়ে বসে। বাহিরটা বড্ড বেশী বাইরে সরে দাঁড়ায়। এই ছোট্ট ঘরে ঠিক আমার বাসের পক্ষে যতটুকু দরকার, তার বেশী কিছুই নেই। সেখানে খাট আছে, টেবিল আছে, চৌকি আছে। সেই আসবাবের সঙ্গে একখণ্ড আকাশকে জড়িত করে রেখে আকাশের শখ ঘরেই মেটাতে চাইনে। আকাশকে পেতে চাই তার স্বস্থানে—বাইরে, পূর্ণভাবে বিশুদ্ধভাবে। দেওয়ালের ভিতর যে আকাশকে বেঁধে রাখা হয়, তাকে আমি ছেড়ে দেবামাত্রই সে আমার যথার্থ কাছে এসে দাঁড়ায়। একেবারেই আমার বসবার চৌকির অনতিদূরে, আমার জানালার গা ঘেঁষে। তার কাজ হচ্ছে মনকে ছুটি দেওয়া। সে যদি নিজে যথেষ্ট ছুটি না পায়, মনকে ছুটি দিতে পারে না।"[১]

*

* *

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গ ভালবাসেন। শহরের বড়ঘরের ছেলে তিনি। কিন্তু তাঁর এই প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ শহুরে ধনীর

১ "পথে ও পথের প্রান্তে"।

মত নয়। তিনি কৃত্রিম সাজানো বাগান পছন্দ করেন না। তাঁর 'শ্যামলী' ও 'পুনশ্চ'র আশে পাশে আছে সামান্য বেল, জুঁই, করবী, গন্ধরাজের কয়েকটি গাছ মাত্র। 'পুনশ্চ'র ঠিক সামনে মাথা তুলে উঠেছে একটি পলাশ আর পশ্চিম পাশে দরজার সামনে একটি অশোকের চারা। কিছু দূরে দক্ষিণ দিকে আছে মহাকবির নাম দেওয়া "সোনাঝুরি", "হিমঝুরি" গাছের সারি। জাতে তারা বিদেশী, আকারে জিরাপের গলার মত দীর্ঘ, আকাশচুম্বী। 'কোণার্কে'র বারান্দা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে একটি নিঃসঙ্গ শিমুল।

আগেই বলেছি, 'উদয়নে'র দক্ষিণ বারান্দার সামনে আছে পাঁচিল-ঘেরা ফুলের বাগান। অতি পরিপাটী করে সাজানো সেই কৃত্রিম উদ্যান। ঝক্‌মকে, পাথরে-মোড়া তার পথগুলি। ডাইনে বাঁয়ে, পূবে পশ্চিমে কারুশিল্পে-অপরূপ পাত্রে পাত্রে আছে দেশী-বিদেশী দুষ্প্রাপ্য ফুলের গাছ। মাঝখানে কৃত্রিম ছোট পাহাড়, তারই একপাশে রাখা আছে পাথরে-খোদাই-করা মহাকবির মূর্তি। ছোট্ট, কৃত্রিম সরোবরটিতে মাঝে মাঝে চরে হাঁসের দল।

শুনেছি, নানা বিদেশী টুরিস্ট-পর্যটক সেই বাগান দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। অতিথি অভ্যাগতেরা দলে দলে এর ছায়াছবি তুলে নিয়ে গেছেন। সেই ছবির মত সাজানো বাগানটি দেখে গৃহস্বামীর রুচির প্রশংসা না করে থাকা যায় না। বিচিত্র উপকরণ ও অলংকরণের ভিড়ের মধ্যেও তাতে আছে একটি রুচির সুসংগতি (balance)। সেই সহজ সুসংগতি বোধ হঠাৎ-বাবুয়ানার ধারকরা ধারণার মধ্যে জন্মায় না। স্বীকার করতেই হবে, সেই কৃত্রিম আড়ম্বর-স্তূপের মধ্যেও আছে একটি অদৃশ্য, অকৃত্রিম, রুচিবান মনের স্পষ্ট ছাপ।

তবু, মহাকবি তা পছন্দ করেন না। তিনি মাঝে মাঝে 'উদয়নে'র দক্ষিণ বারান্দায় বসেন বটে, বাগানের সৌন্দর্যও উপভোগ করেন।

কিন্তু শুনেছি, তিনি অন্তরঙ্গদের কাছে বারবার বলেছেন, এ রথীর বাগান, আমার বাগান নয়।

কৃত্রিম কোন বস্তুর উপরই রবীন্দ্রনাথের স্বাভাবিক অনুরাগ নেই। সজ্জার অজুহাতে তাঁর কোন বাড়িতে আসবাবপত্রের বাহুল্য নেই। শোবার ঘরে সামান্য একখানি খাট, কখন কাঠের, কখন-বা ইঁট-সিমেণ্ট দিয়ে গাঁথানো। কয়েকখানি সাধারণ বসবার চৌকি, তু-একটি আরাম চৌকি, কাজ করবার কাঠের ছোট টেবিল, কয়েকটি মোড়া। কাঁচ-বসানো জানালায় জানালায় রোদ আটকাবার জন্য শ্রীনিকেতনের তাঁতে-বোনা সতরঞ্চির মত পুরু পর্দা। তু-এক টুকরো কার্পেট। তাঁর ঘরের ভিতরে বা বাইরের বারান্দায় কোথাও দামী দামী বিলাসবস্তু বা প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিসপত্র দেখিনি। অবশ্য একথাও সত্যি, ঘরের অতিরিক্ত উপকরণকে তিনি কাজে লাগাতে জানেন। তাই তা আর দর্শকদের চোখে অতিরিক্ত বলে ঠেকে না। দৈনন্দিন জীবনযাপনাকে সুন্দর করে তোলার শক্তি তাঁর অসামান্য। নিজের রুচিকে ব্যবহারিক জীবনে রূপ দেবার চরম রূপকার তিনি।

রবীন্দ্রনাথ সময়ে সময়ে জাঁকজমক, আড়ম্বর যে পছন্দ করেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু সে বিলাস তাঁর সাময়িক। তাঁর অন্তর্‌প্রকৃতির মূলে প্রধানতঃ আছে সহজ এবং অনাড়ম্বরের প্রতি তীব্র আগ্রহ। তাঁর উদাসী মন বেশীদিন আড়ম্বরের জঞ্জালে শান্তিতে বাস করতে পারে না। একখানি চিঠিতে এ বিষয়ে তাঁর হৃদয়ের চমৎকার ছবি ফুটে উঠেছে।

১৯২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাস। কিছুদিন আগে দক্ষিণ আমেরিকার পেরুরাজ্য থেকে সেখানকার স্বাধীনতা-শতবার্ষিকী উৎসবে যোগদান করার জন্য মহাকবির নিমন্ত্রণ আসে। তিনি দক্ষিণ আমেরিকা-যাত্রার পথে কয়েকদিন কলম্বোতে বিশ্রাম করেন। স্থানীয় একজন লক্ষপতি একটি বিরাট প্রাসাদে মহামান্য অতিথির থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ কয়েকদিন মাত্র বাস করেই সেই প্রাসাদের কৃত্রিম রাজ-আড়ম্বরের পরিমণ্ডলে অস্থির হয়ে উঠলেন। তিনি সে সময়ের একখানি চিঠিতে জানাচ্ছেন তাঁর মনের অবস্থা: "কালস্রোতে যে বাড়িতে এসে আছি, এ একজন লক্ষপতির বাড়ি। প্রকাণ্ড প্রাসাদ। আরামে বাস করার পক্ষে অত্যন্ত বেশী ঢিলে, ঘরগুলোর প্রকাণ্ড হাঁ মানুষকে গিলে ফেলে। যে ঘরে বসে আছি, তার জিনিসগুলো এত বেশী ফিটফাট যে মনে হয়, সেগুলো ব্যবহার করবার জন্য নয়, সাজিয়ে রাখবার জন্য। বসবার শোবার আসবাবগুলো শুচিবায়ুগ্রস্ত গৃহিণীর মত। সন্তর্পণে থাকে, কাছে গেলে যেন মনে মনে সরে যায়। এই ধনী ঘরের অতি পারিপাট্য—এও যেন একটা আবরণের মত।"[১]

মহাকবির মনে আছে আধুনিক সভ্যতার বস্তুতান্ত্রিকতার প্রতি গভীর বিরাগ। তাই দৈনন্দিন জীবনে বস্তুর পুঞ্জীভূত উপদ্রব তাঁর কাছে হয়ে ওঠে অসহ্য উৎপীড়ন।

*

* *

প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল সম্বন্ধে মানুষ রবীন্দ্রনাথের আর একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। তিনি পাহাড়ে পর্বতে বাস করতে ভালবাসেন না, সমতলভূমিকেই বেশী পছন্দ করেন। তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে যতদিন তিনি পাহাড়ে পাহাড়ে কাটিয়েছেন, তার চেয়ে ঢের বেশী দিন কাটিয়েছেন সমতলে। পদ্মার চরে বোট বেঁধে একাকী মহানন্দে মাসের পর মাস বাস করেছেন। এমন ভাবে পাহাড়ে বাসা বাঁধার চেষ্টা কখনও করেননি।

অবশ্য, এর একটা সাধারণ কারণ আছে। রবীন্দ্রনাথ গরম যত অনায়াসে সহ্য করতে পারেন, শীত তত পারেন না। সাধারণতঃ, আমাদের ধারণা, শীত পড়লে মানুষের কাজের উৎসাহ বেড়ে যায়।

১ "ভানুসিংহের পত্রাবলী"।

মহাকবির পক্ষে এ কথা পুরোপুরি সত্য নয়। অবশ্য, তিনি কোন ঋতুতেই পরিশ্রম কম করেন না। কিন্তু শীতের 'উত্তুরে' হাওয়া যে তাঁকে বেশ একটু জড়সড় করে ফেলে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। একটা দৃষ্টান্ত দিই। সেদিনের ঘটনাটা বেশ মনে পড়ে। ১৯৩৬ সাল। শান্তিনিকেতনে সবেমাত্র শীত শুরু হয়েছে। হঠাৎ সেদিন কনকনে ঠাণ্ডা পড়ল আর উত্তুরে হাওয়া বেতাল হয়ে উঠল। আমি মহাকবির সঙ্গে দেখা করতে গেছলুম। তিনি 'উদয়নে'র একতলায় একখানি ভিতরকার ঘরে অর্ধশায়িত অবস্থায় সোফায় বসে বসে বিদেশী পত্রিকা পড়ছিলেন। গায়ে গরম জোব্বা, পা গরম চাদরে ঢাকা। আগের দিন রাত থেকে তাঁর শরীর খারাপ হয়েছিল। গলায় বেদনা, সামান্য সর্দির ভাব, মুখ শুখনো। আমি ঘরে ঢুকে প্রণাম করার জন্য হাত বাড়াতেই তিনি কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন, ওই সামনের মোড়াটায় বস। পা আমার দুর্লভ আজ। কথা বলতে বলতে তাঁর শুকনো মুখে ভেসে উঠল এক ফালি অপরূপ হাসি।

রবীন্দ্রনাথ যে পাহাড় খুব বেশী ভালবাসেন না, তা নানা চিঠিতে স্বীকার করেছেন। "ভানুসিংহের পত্রাবলী"তে এক জায়গায় আছে, "পাহাড় আমার কেন ভাল লাগে না, বলি। সেখানে গেলে মনে হয়, আকাশটাকে যেন আড়কোলা করে ধরে একদল পাহারওয়ালার হাতে জিম্মা করে দেওয়া হয়েছে, সে একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। আমরা মর্তবাসী মানুষ। সীমাহীন আকাশে আমরা মুক্তির রূপটি দেখতে পাই। সেই আকাশটাকে যদি তোমার হিমালয় পাহাড় একপাল মহিষের মত শিং গুঁতিয়ে মারতে চায়, তাহলে সেটা আমি সইতে পারিনে। আমি খোলা আকাশের ভক্ত। সেইজন্য বাঙলা দেশের বড় বড় দিল-দরাজ নদীর ধারে অবারিত আকাশকে ওস্তাদ মেনে তার কাছে আমার গানের গলা সেধে এসেছি।"

রবীন্দ্রনাথের সব চেয়ে প্রিয় জায়গা নদীর তীর। তাঁর কাব্য-

জীবনের প্রথম সৃষ্টি-মুখর যুগ কেটেছে পদ্মার চরে চরে। আজকাল বছরের বেশী দিন তাঁর কাটে শান্তিনিকেতনে। সেখানে কোন নদী নেই। একটি নদী 'ভুবন ডাঙার মাঠে'র বেশ কয়েক মাইল দূর দিয়ে বহে গেছে, নাম কোপাই। অবশ্য কেবল বর্ষাকালেই তা হচ্ছে নদী। অন্য ঋতুতে নিছক নালা বললেই চলে। তবু রবীন্দ্রনাথ নাকি কোন কোন অন্তরঙ্গদের কাছে দুঃখ করে বলেছেন, অন্ততঃ কোপাইটাও যদি শান্তিনিকেতনের পাশ দিয়ে বয়ে যেত।

তাঁর অন্তরে নদীতীর সম্বন্ধে চিরকাল আছে একটি সহজ আকুলতা। একদিনের ঘটনায় তার প্রমাণ পেয়েছিলুম। ১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসের শেষের দিক। কিছুদিন আগে তিনি হঠাৎ অচৈতন্য হয়ে পড়েন। সেই অবস্থায় তাঁর প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা কাটে। নির্দিষ্ট কোন রোগ নির্ণয় করা প্রথমটা সম্ভব হয় না। শেষে কলকাতা থেকে ডঃ নীলরতন সরকার এসে চিকিৎসা করে তাঁকে সুস্থ করে তোলেন। মহাকবি মৃত্যুর রহস্যলোক থেকে ফিরে আসার সময় যেটুকু অস্পষ্ট অথচ দুর্লভ অনুভব লাভ করেছিলেন, তার ছবি ফুটে উঠেছে এই সময়ের লেখা তাঁর "প্রান্তিক" কাব্যে।

অসুখ গেল, কিন্তু শরীর পুরোপুরি ভাল হল না। রবীন্দ্রনাথ রীতিমত চিকিৎসার উদ্দেশে শেষে কলকাতায় এলেন, অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের বেলঘরিয়ার বাড়িতে উঠলেন। তখন পূজোর ছুটি। আমিও কলকাতায় রয়েছি। বিশ্বভারতীর গ্রন্থন-বিভাগের সহ-কর্মসচিব[১] একদিন হঠাৎ খবর দিলেন, বেলঘরিয়ায় আমার ডাক পড়েছে।

"গল্পগুচ্ছে"র সম্পাদনার ফাইল নিয়ে দুজনে উপস্থিত হলুম। বিকাল বেলা। রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ শরীরেই সারাদিন ছবি এঁকে কাটিয়েছেন। আমরা যেতে দোতলার ঘরে বসে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করতে লাগলেন। এমন সময় রথীন্দ্রনাথ এসে উপস্থিত

১ কিশোরীমোহন সাঁতরা।

হলেন। তিনি সে সময়ে উত্তরপাড়ায় গঙ্গার উপর বোটে বাস করছিলেন। মহাকবি ছেলেকে দেখে খুশী হয়ে উঠলেন। পাশের টেবিল থেকে সদ্য-আঁকা ছবিখানা তুলে নিয়ে ছেলেমানুষের মত আগ্রহ ভরে বললেন, রথী, দেখ ত ছবিখানা কেমন হল? বউমার ত খুব ভাল লেগেছে। তারপর একটু থেমে কথা শেষ করলেন, আমার অনেক দিনের ইচ্ছে, এমনি একটা নদীর ধারে বাড়ি করি। তা আর দেখছি, এ জীবনে হল না।

কে জানে, ঠিক কিনা। কিন্তু মনে হল, কথা শেষের সঙ্গে সঙ্গে হয়ত মহাকবির বুক থেকে নেমে এল একটা চাপা, নিঃশব্দ নিঃশ্বাস।

আমরা চুপ করে ছবিখানি দেখতে লাগলুম। তাতে ছিল, একটি স্রোতস্বিনী, তার তীরে বিশ্বপ্রকৃতির উচ্ছ্বসিত বন্যলীলা আর নদী তীরের এক কোণে একটি কুটীর। নদীর আকর্ষণের কথা নানা চিঠিতে তিনি প্রকাশ করেছেন, "অনেক দিন বোলপুরের শুখনো ডাঙায় কাটিয়ে এসেছি। এখন এই নদীর উপর এসে মনে হচ্ছে পৃথিবীর যেন মনের কথাটি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। নদী আমি ভারী ভালবাসি। আর ভালবাসি আকাশ। নদীতে আকাশে চমৎকার মিলন, রঙে রঙে, আলোয় ছায়ায়,—ঠিক যেন আকাশের প্রতিধ্বনির মত। আকাশ পৃথিবীতে আর কোথাও আপনার সাড়া পায় না—এই জলের উপর ছাড়া।"[১]

মনে হয়, নদীকে ভালবাসার একটি স্বাভাবিক কারণ আছে মানুষ রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির মধ্যে। তাঁর মূল সত্তা নানাখণ্ড সত্তার বিরোধের প্রভাবে নিত্য অশান্ত। নদীর স্রোতে আছে নিত্য-চলা। আর মহাকবির অন্তরে আছে নিত্য দোলা। তাই হয়ত নদীর তীরে তিনি একটি মনের মত 'স্বাভাবিক' পরিবেশ খুঁজে পান। হয়ত-বা, এই এক সঙ্গে ভিতরে বাইরে চাঞ্চল্যের অনুভূতি তাঁর নদীতীরের দিন যাপনায় আনে একটা সহজ সংগতিবোধ।

১ "ভানুসিংহের পত্রাবলী"।

*

* *

মনে প্রশ্ন জাগে, বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি মানুষ রবীন্দ্রনাথর অনুরাগের মূল রূপটি কি ? বিষয়টি যেমন গভীর, এর বিচারও তেমনি কঠিন।

তবু বলি, ররীন্দ্রনাথের কাছে প্রকৃতির সঙ্গ-কামনা নিতান্ত বিলাসীর খেয়াল নয়। তা হচ্ছে তাঁর শিল্পীসত্তার প্রাণধারণের একান্ত প্রয়োজন। এ না হলে তাঁর দিন চলে না। জীবনের আনন্দ হয়ে আসে নিষ্প্রভ, কর্মশক্তি শিথিল। সাধারণ মানুষ যেমন অন্নজলের প্রত্যাশী, তিনি তেমনি প্রকৃতি সঙ্গের অনুরাগী। প্রকৃতি থেকে তিনি গ্রহণ করেন নিত্যদিনের 'মনের আরাম, প্রাণের শান্তি'। তাঁর একটি গানে আছে ঃ

"বাতাস আনে কেন জানি, কোন্ গগনের গোপন বাণী,
পরানখানি দেয় যে ভরে।
সোনার আলো কেমনে হে, রক্তে নাচে সকল দেহে।
কারে পাঠাও ক্ষণে ক্ষণে আমার খোলা বাতায়নে
সকল হৃদয় লয় যে হরে।"

এই চরণগুলির মধ্যে মানুষ রবীন্দ্রনাথের মনের গোপন কথাই রূপ পেয়েছে।

বিশ্ব-প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ আছে তাঁর অন্তর্‌সত্তার মূলে।[১]

১ এই প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত চিঠিখানি উল্লেখযোগ্য ঃ "আমার পুরাতন চিঠিপত্রের এক জায়গায় ছিল, আমি একদিন সমুদ্র-স্নানসিক্ত তরুণ পৃথিবীতে গাছ হইয়া পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছিলাম। আপনি সম্পাদকের কুঠার লইয়া আমার এই গাছের স্মৃতির গোড়ায় কোপ মারিতে উদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু এ ত অনাবশ্যক ডালপালা ছাঁটিয়া দেওয়া নয়, এ যে প্রাণে আঘাত করা। কেননা এ আমার প্রাণে আঘাত করা। আমার প্রাণের মধ্যে গাছের প্রাণের গূঢ় স্মৃতি আছে। আজ মানুষ

তিনি ছোটবেলা থেকেই বিশ্ব-প্রকৃতির নিবিড় সংসর্গের জন্য অজানা ব্যাকুলতা অনুভব করেছেন। "জীবনস্মৃতি"তে আছে, "বাড়ির বাহিরে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল। এমন কি বাড়ির ভিতরেও আমরা সর্বত্র যেমন-খুশি যাওয়া-আসা করিতে পারিতাম না। সেই-জন্য বিশ্ব-প্রকৃতিকে আড়াল-আবডাল হইতে দেখিতাম। বাহির বলিয়া একটি অনন্তপ্রসারিত পদার্থ ছিল, যাহা আমার অতীত, অথচ যাহার রূপ শব্দ গন্ধ দ্বার-জানালার নানা ফাঁক-ফুকর দিয়া এদিক-ওদিক হইতে আমাকে চকিতে ছুঁইয়া যাইত। সে যেন গরাদের ব্যবধান দিয়া নানা ইশারায় আমার সঙ্গে খেলা করিবার নানা চেষ্টা করিত। সে ছিল মুক্ত, আমি ছিলাম বদ্ধ। মিলনের উপায় ছিল না, সেইজন্য প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল। * *

হইয়াছি বলিয়াই এ কথা কবুল করিতে পারিতেছি। শুধু গাছ কেন, সমস্ত জড়জগতের স্মৃতি আমার মধ্যে নিহিত আছে। বিশ্বের সমস্ত সম্পদ, স্পন্দন আমার সর্বাঙ্গে আত্মীয়তার পুলক সঞ্চার করিতেছে—আমার প্রাণের মধ্যে তরুলতার বহু যুগের মূক আনন্দ আজ ভাষা পাইয়াছে। নহিলে আজ গাছে গাছে যখন আমের মুকুলের উচ্ছ্বাস একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে, তখন আমি কোন্ নিমন্ত্রণে বসন্ত-উৎসবের আয়োজন করিতে যাই? আমার মধ্যে একটা বিপুল আনন্দ আছে। সে এই জল স্থল গাছপালা পশুপক্ষীর আনন্দ—সে আপনি আমাকে কবুল করিতে দিবেন না কেন? পাছে লোকে আমাকে উপহাস করে? আমি যদি কাল আলপাকার চাপকান-পরা আপিসের কেরানী জীবনের পরিচয় দিই, তবে লোকে সেটাকে একটা সত্য পদার্থ বলিয়া গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িতে থাকে। আর আমার যে পরিচয়টা জগৎজোড়া পরিচয় সেটাতে যদি ট্রামগাড়ির যাত্রী ও সিজন টিকিটওয়ালাদের হাসি পায়, তবে সে হাসি আমাকে হজম করিতে হইবে।

"দেখুন, আমি আমার বোটের খোলা জানালায় বসিয়া এই পুরাতন পৃথিবীটার গৈরিক রঙের মাটির উপরে যখন সূর্যের আলো পড়িতে দেখিয়াছি, তখন আমার সমস্ত দেহটা যেন বিস্তীর্ণ হইয়া ঐ ধূলা এবং ঘাসের মধ্যে দিক-প্রান্ত পর্যন্ত অবাধে আতত হইয়া গিয়াছে। আমি সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র এবং মাটি-

"বাহিরের সংস্রব আমার পক্ষে যতই দুর্লভ থাক, বাহিরের আনন্দ আমার পক্ষে হয়ত সেই কারণেই সহজ ছিল। উপকরণ প্রচুর থাকিলে মনটা কুড়ে হইয়া পড়ে, সে কেবলই বাহিরের উপরেই সম্পূর্ণ বরাত দিয়া বসিয়া থাকে। ভুলিয়া যায়, আনন্দের ভোজে বাহিরের চেয়ে অন্তরের অনুষ্ঠানই গুরুতর। শিশুকালে মানুষের সর্বপ্রথম শিক্ষাটাই এই। তখন তাহার সম্বল অল্প এবং তুচ্ছ। কিন্তু আনন্দলাভের পক্ষে ইহার চেয়ে বেশী তাহার কিছুই প্রয়োজন নাই। সংসারে যে হতভাগ্য শিশু খেলার জিনিস অপর্যাপ্ত পাইয়া থাকে, তাহার খেলা মাটি হইয়া যায়।

"বাড়ির ভিতরে আমাদের যে বাগান ছিল, তাহাকে বাগান বলিলে অনেকটা বেশি বলা হয়। একটা বাতাবি লেবু, একটা কুলগাছ, একটা বিলাতী আমড়া ও একসার নারিকেল গাছ তাহার প্রধান সংগতি। মাঝখানে ছিল একটা গোলাকার বাঁধানো চাতাল। তাহার ফাটলের রেখায় রেখায় ঘাস ও নানাপ্রকার গুল্ম অনধিকার প্রবেশপূর্বক জবর-দখলের পতাকা রোপণ করিয়াছিল। যে ফুলগাছগুলো অনাদরেও মরিতে চায় না, তাহারাই মালীর নামে কোন অভিযোগ না আনিয়া নিরভিমানে যথাশক্তি আপন কর্তব্য পালন করিয়া যাইত।** বাড়ির ভিতরের বাগান আমার সেই স্বর্গের বাগান ছিল,—সেই আমার যথেষ্ট ছিল। বেশ মনে পড়ে, শরৎ-

পাথর জল সমস্তের সঙ্গে একসঙ্গে আছি—এই কথাটা এক-এক শুভ মুহূর্তে যখন আমার মনের মধ্যে স্পষ্ট সুরে বাজে, তখন একটা বিপুল অস্তিত্বের নিবিড় হর্ষে আমার দেহ মন পুলকিত হইয়া উঠে। ইহা আমার কবিত্ব নহে, ইহা আমার স্বভাব। এই স্বভাব হইতেই আমি কবিতা লিখিয়াছি, গান লিখিয়াছি, গল্প লিখিয়াছি। অতএব ইহাকে গোপন করিবেন না। ইহাকে লইয়া আমি লেশমাত্র লজ্জাবোধ করিনা। আমি মানুষ, এইজন্যই আমি ধূলামাটি জল গাছপালা পশুপাখী সমস্তই,—ইহাই আমার গৌরব। আমার চেতনায় জগতের ইতিহাস দীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে।***"

কালের ভোরবেলায় ঘুম ভাঙিলেই এই বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইতাম। একটি শিশির-মাখা ঘাসপাতার গন্ধ ছুটিয়া আসিত। এবং স্নিগ্ধ নবীন রৌদ্রটি লইয়া আমাদের পূবদিকের প্রাচীরের উপর নারিকেল পাতার কম্পমান ঝালরগুলির তলে প্রভাত আসিয়া মুখ বাড়াইয়া দিত।”

এত গেল শৈশবের কথা। যৌবন এবং পরিণত বয়সেও বিশ্ব-প্রকৃতির আকর্ষণ বারবার রবীন্দ্রনাথকে টেনে নিয়ে গেছে নিরালায় —লোকসমাজের গণ্ডির বাইরে।[১] নির্জন, নিভৃত পরিমণ্ডলে তাঁকে দিয়েছে মায়ের স্নেহ, বন্ধুর প্রীতি। হয়ত তাঁকে আপন খেয়ালমত গড়ে তুলেছে। হয়ত তাঁর বিকাশোন্মুখ মনের ফাঁকগুলিকে ভরিয়ে দিয়েছে নিঃশব্দ দানে। জীবনের মাঝ-পর্বের বেশ কয়েক বছর তাঁর কেটেছে কলকাতা থেকে বহুদূরে—পদ্মাতীরের পল্লী অঞ্চলে। সেখানে ছিল ঠাকুরবাড়ির জমিদারি। তিনি সেই জমিদারি পরিচালনার ভার নিয়ে প্রবাসে বাস করেছেন। জমিদারির নানা অঞ্চলে জমিদারের বসবাসের জন্য ছিল প্রাসাদতুল্য কুঠিবাড়ি। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সাধারণতঃ কুঠিবাড়িতে গিয়ে থাকতেন না। তিনি পদ্মার বুকে নৌকার উপর বাসা বাঁধতেন।

১ তিনি “ভানুসিংহের পত্রাবলী”র একখানি চিঠিতে লিখেছেন ঃ “কলকাতা শহরটা আমি মোটেই পছন্দ করিনে। মনে হয়, যেন ইটকাঠের একটা মস্ত জন্তু আমাকে একেবারে গিলে ফেলেছে। তার উপরে আবার আকাশ মেঘে লেপা, রাত্তির থেকে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। শান্তিনিকেতনের মাঠে যখন বৃষ্টি নামে, তখন তার ছায়ায় আকাশের আলো করুণ হয়ে আসে, ঘাসে ঘাসে পুলক লাগে, গাছগুলি যেন কথা কইতে চায়। আমার মনের মধ্যে গান জেগে ওঠে আর তার সুর গিয়ে পৌছয় দিনুর ঘরে। আর এখানে নব-বর্ষা বাড়ির ছাদে ঠোকর খেতে খেতে খোঁড়া হয়ে পড়ে। কোথায় তার নৃত্য, কোথায় তার গান, কোথায় তার সবুজ রঙের উত্তরীয়! কোথায় তার পূবে বাতাসে উড়ে-পড়া জটাজাল!”

গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় পাগল হাওয়া তাঁর বোটের জানালার ধারে এসে লুকোচুরি খেলে যেত। শরৎ নিশীথে ঘননীল আকাশের তারা অবাক হয়ে চেয়ে থাকত তাঁর দিকে। বসন্তে ভোরবেলাকার আলোর সুরে তাঁর চারিদিকের নিখিল ভুবন ছেয়ে যেত। বিশ্ব-প্রকৃতির সংসর্গে মানুষ রবীন্দ্রনাথের কাঙাল মন ক্ষণে ক্ষণে এইভাবে ভরে উঠত অজানা আনন্দের নিবিড়তায়। তাঁর তখনকার চিঠির পর চিঠিতে ধরা আছে সেই আনন্দের ইতিহাস।

১৮৯৪ সাল, ৮ই অগাস্ট তারিখ। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ থেকে লিখছেন, "আজ নদীর কলধ্বনির প্রত্যেক তরললকার আমার সর্বাঙ্গে যেন কোমল আদর বর্ষণ করছে। মনটি আমার আজ অত্যন্ত নির্জন এবং সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। মেঘমুক্ত আলোকে উজ্জ্বল, শস্যহিল্লোলিত, জলকল্লোলিত চতুর্দিকটার সঙ্গে মুখোমুখি বিশ্রদ্ধ প্রীতিসম্মিলনের উপযুক্ত একটি নীরব গোপনতা আমার মধ্যে স্থিরভাবে বিরাজ করছে। আমি জানি, আজ সন্ধ্যার সময় যখন কেদারা টেনে বোটের ছাদের উপর একলাটি বসব, তখন আমার আকাশে আমার এই সন্ধ্যা-তারাটি ঘরের লোকের মত দেখা দেবে। আমি শীতের সময় যখন এই পদ্মাতীরে আসতুম, কাছারি থেকে ফিরতে অনেক দেরি হত। বোট ওপারে বালির চরের কাছে বাঁধা থাকত। ছোট জেলেডিঙি চড়ে নিস্তব্ধ নদীটি পার হতুম। তখন এই সন্ধ্যাটি সুগম্ভীর অথচ সুপ্রসন্ন মুখে আমার জন্য অপেক্ষা করে থাকত। এখানকার প্রকৃতির সঙ্গে সেই আমার একটি মানসিক ঘরকন্নার সম্পর্ক।"[১]

এই সময়ের আর একখানি চিঠিতে চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে তাঁর মনের আবেগঃ "কাল আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে বর্ষার নব রাজ্যাভিষেক বেশ রীতিমত আড়ম্বরের সঙ্গে সম্পন্ন হয়ে গেছে। দিনের বেলাটা খুব গরম হয়ে বিকেলের দিকে ভারী ঘনঘটা মেঘ

১ "ছিন্নপত্র"।

করে এল। ভাবলুম, বর্ষার প্রথম দিনটা। আজ বরঞ্চ ভেজাও ভাল, তবু অন্ধকূপের মধ্যে দিন যাপন করব না। জীবনে ১৮৯৩ সাল আর দ্বিতীয়বার আসবে না। ভেবে দেখতে গেলে, পরমায়ুর মধ্যে আষাঢ়ের প্রথম দিন আর কবারই বা আসবে! মেঘদূত লেখার পর থেকে আষাঢ়ের প্রথম দিনটা একটা বিশেষ চিহ্নিত দিন হয়ে গেছে—নিদেন আমার পক্ষে। আমি প্রায়ই এক-এক সময়ে ভাবি, এই যে আমার জীবনে প্রত্যহ একটি একটি করে দিন আসছে, কোনটি সূর্যোদয়-সূর্যাস্তে রাঙা, কোনটি ঘনঘোর মেঘে স্নিগ্ধশীতল, কোনটি পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় সাদা ফুলের মত প্রফুল্ল, এগুলি কি আমার কম সৌভাগ্য! এবং এরা কি কম মূল্যবান। হাজার বৎসর পূর্বে কালিদাস সেই যে আষাঢ়ের প্রথম দিনকে অভ্যর্থনা করেছিলেন, আমার জীবনেও প্রতি বৎসর সেই আষাঢ়ের প্রথম দিন তার সমস্ত আকাশ-জোড়া ঐশ্বর্য নিয়ে উদয় হয়। সেই প্রাচীন উজ্জয়িনীর প্রাচীন কবির—সেই বহুকালের শত শত সুখদুঃখ বিরহমিলনময় নরনারীদের আষাঢ়স্য প্রথম দিবসঃ। সেই অতি-পুরাতন আষাঢ়ের প্রথম মহাদিন আমার জীবনে প্রতি বৎসর একটি একটি করে কমে যাচ্ছে। অবশেষে এক সময় আসবে, যখন এই কালিদাসের দিন, এই মেঘদূতের দিন, এই ভারতবর্ষের বর্ষার চিরকালীন প্রথম দিন, আমার অদৃষ্টে আর একটিও অবশিষ্ট থাকবে না। একথা ভাল করে ভাবলে পৃথিবীর দিকে আবার ভাল করে চেয়ে দেখতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে, জীবনের প্রত্যেক সূর্যোদয়কে সজ্ঞানভাবে অভিবাদন করি এবং প্রত্যেক সূর্যাস্তকে পরিচিত বন্ধুর মত বিদায় দিই। আমি যদি সাধুপ্রকৃতির লোক হতুম, তাহলে হয়ত মনে করতুম, জীবন নশ্বর, অতএব প্রতিদিন বৃথা ব্যয় না করে সৎকার্যে এবং হরিনামে যাপন করি। কিন্তু আমার সে প্রকৃতি নয়। তাই আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, এমন সুন্দর দিনরাত্রিগুলি আমার জীবন থেকে প্রতিদিন চলে যাচ্ছে—এর সমস্তটা গ্রহণ করতে

পারছিনে। এই সমস্ত রঙ, এই আলো এবং ছায়া, এই আকাশ-ব্যাপী শব্দসমারোহ, এই দ্যুলোকভূলোকের মাঝখানে সমস্ত শূন্য পরিপূর্ণ করা শান্তি এবং সৌন্দর্য, এর জন্য কি কম আয়োজনটা চলছে। কত বড় উৎসবের ক্ষেত্রটা! জগৎ থেকে এতই তফাতে আমরা বাস করি। লক্ষ লক্ষ যোজন দূর থেকে লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে অনন্ত অন্ধকারের পথে যাত্রা করে একটি তারার আলো এই পৃথিবীতে এসে পৌঁছয় আর আমাদের অন্তরে এসে প্রবেশ করতে পারে না,—সে যেন আরও লক্ষ যোজন দূরে! রঙিন সকাল এবং রঙিন সন্ধ্যাগুলি দিগ্‌বধূদের ছিন্ন কণ্ঠহার থেকে এক একটি মানিকের মত সমুদ্রের জলে খসে খসে পড়ে যাচ্ছে, আমাদের মনের মধ্যে একটাও এসে পড়ে না। সেই বিলেত যাবার পথে লোহিত সমুদ্রের স্থির জলের উপর যে একটি অলৌকিক সূর্যাস্ত দেখেছিলুম, সে কোথায় গেছে! কিন্তু ভাগ্যিস আমি দেখেছিলুম! আমার জীবনে ভাগ্যিস সেই একটি সন্ধ্যা উপেক্ষিত হয়ে ব্যর্থ হয়ে যায়নি! অনন্ত দিনরাত্রির মধ্যে সেই একটি অত্যাশ্চর্য সূর্যাস্ত আমি ছাড়া পৃথিবীর আর কোন কবি দেখেন নি। আমার জীবনে তার রঙ রয়ে গেছে। এমন এক একটি দিন এক একটি সম্পত্তির মত। আমার সেই পেনিটির বাগানে গুটিকতক দিন, তেতলার ছাদের গুটিকতক রাত্রি, পশ্চিম ও দক্ষিণের বারান্দায় গুটিকতক বর্ষা, চন্দননগরের গঙ্গার গুটিকতক সন্ধ্যা, দার্জিলিঙে সিঞ্চল শিখরের একটি সূর্যাস্ত ও চন্দ্রোদয়—এই রকম কতকগুলি উজ্জ্বল, সুন্দর ক্ষণ-খণ্ড আমার যেন ফাইল করা রয়েছে। ছেলেবেলায় বসন্তের জ্যোৎস্নারাত্রে যখন ছাদে পড়ে থাকতুম, তখন জ্যোৎস্না যেন মদের শুভ্র ফেনার মত একেবারে উপচে পড়ে নেশায় আমাকে ডুবিয়ে দিত।"[১]

১ "ছিন্নপত্র", ১২৯৯ সালের ২রা আষাঢ় তারিখে লেখা চিঠি।

*

* *

বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি ভালবাসার দিক থেকে মানুষ রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমকালের বিরুদ্ধে চরম বিদ্রোহ প্রকাশ করেছেন। একালের বিজ্ঞানকেন্দ্রিক সভ্যতা হচ্ছে নগরমুখী। এ যুগের মানুষ ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রে বিশ্বপ্রকৃতির সংস্রবকে ক্রমশঃ হারিয়ে ফেলছে। দেশে দেশে গড়ে উঠছে মহানগরের পর মহা-নগর। তার সান্নিধ্যে আছে উৎপাদন শিল্পের বিশাল কেন্দ্র। তত্ত্ববিদ্যার সাধনায় মানুষের আস্থা নষ্ট হয়েছে। দল দল লোকে সযত্নে অর্জন করছে কারিগরী বিদ্যার দক্ষতা। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে হৃদয়ের সহজ যোগ আজ ছিন্নপ্রায়।

রবীন্দ্রনাথ এই যুগধর্মকে নিজের জীবনে পুরোপুরি বর্জন করেছেন। তিনি মহাপৌরুষভরে মহানগরীর প্রাচীন পারিবারিক আশ্রয় ত্যাগ করে বনবাসে প্রায় অর্ধেক জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। এদিক থেকে তাঁর একমাত্র তুলনা হয়ত ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ।

অবশ্য আরও দুচারজন বিদেশী শিল্পীর জীবনেও প্রেরণা দিয়েছে বিশ্বপ্রকৃতির প্রভাব। কিন্তু মনে হয়, তা হচ্ছে মূলতঃ 'তাত্ত্বিক আদর্শ' হিসাবে—'প্রাণবন্ত শক্তি' হিসাবে নয়। তাতে হয়ত বা আবেগের গতি ছিল, কিন্তু ছিল না নিবিড় অনুভবের দীপ্তি।

এই প্রসঙ্গে স্বভাবতঃ গান্ধীজীর কথাও মনে আসে। তিনিও সমকালের যুগধর্মের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গ্রহণ করেছেন বনবাস। কিন্তু তাঁর আদর্শ হল অন্য জাতের। তিনি প্রধানতঃ কর্মযোগী। রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ শিল্পযোগী। গান্ধীজীর বনবাসের মূলে আছে অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রিকতার আদর্শ, আর আছে গ্রামমুখীন, প্রাচীন সভ্যতা পুনর্‌প্রতিষ্ঠার চেষ্টা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বনবাসের আদিতে আছে পুরাকালের তপোবন স্থাপনার প্রেরণা। তাঁর আদর্শের চরম কথা হচ্ছে, প্রকৃতির সঙ্গ সম্ভোগ করো, মনুষ্যত্বের পরম বিকাশ করো।

তাঁর পল্লীবাস অর্থনৈতিক বা সামাজিক শক্তির বিকেন্দ্রীকরণ উদ্দেশে নয়।

মহাকবির মনে আছে বিশেষ একটি দৃঢ় বিশ্বাস। তাঁর ধারণা, বিশ্ব-প্রকৃতির নিবিড় আশ্রয় ছাড়া মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটা অসম্ভব। এ আদর্শ তাঁর কাছে একটি নিছক তত্ত্বমাত্র নয়। এ তাঁব জীবন-সাধনার অঙ্গ। তিনি ছোটদের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির যোগ সৃষ্টি করার উদ্দেশেই গড়ে তুলেছেন শান্তিনিকেতন শিক্ষাশ্রম। তাঁর নিজের কথায় আছেঃ "ছেলেরা বিশ্বপ্রকৃতির অত্যন্ত কাছের সামগ্রী। আরাম কেদারায় তারা আরাম চায় না, গাছের ডালে তারা চায় ছুটি। বিরাট প্রকৃতির অন্তরে আদিম প্রাণের বেগ নিগূঢ় ভাবে চঞ্চল, শিশুর প্রাণে সেই বেগ গতি সঞ্চার করে। জীবনের আরম্ভে অভ্যাসের দ্বারা অভিভূত হবার আগে কৃত্রিমতার জাল থেকে ছুটি পাবার জন্য ছেলেরা ছটফট করতে থাকে, সহজ প্রাণলীলার অধিকার তারা দাবি করে বয়স্কদের শাসন এড়িয়ে। আরণ্যক ঋষিদের মনের মধ্যে ছিল চিরকালের ছেলে। তাই কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অপেক্ষা না রেখে তাঁরা বলেছিলেন, 'যদিদং কিঞ্চ সবং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং'—এই যা কিছু সমস্তই প্রাণ হতে নিঃসৃত হয়ে প্রাণেই কম্পিত হচ্ছে। একি বর্গসঁ-র বচন! এ মহান্ শিশুর বাণী। বিশ্বপ্রাণের এই স্পন্দন লাগাতে দাও ছেলেদের দেহে মনে শহরের বোবা, কালা, মরা দেওয়ালগুলোর বাইরে। আমাদের আশ্রমে ছেলেরা এই প্রাণময়ী প্রকৃতিকে কেবল যে খেলায় ধুলায় নানা রকম করে কাছে পেয়েছে তা নয়, আমি গানের রাস্তা দিয়ে নিয়ে গেছি তাদের মনকে প্রকৃতির রঙমহলে।"[১]

মহাকবি এই প্রবন্ধে তাঁর অন্তরের বিশ্বাসকে দার্শনিকের ভাষায় বলেছেন। কিন্তু মনে পড়ে, একদিন শান্তিনিকেতনে পরম আবেগ-ভরে একথা প্রকাশ করেছিলেন। আজও তাঁর সেই তেজোদীপ্ত,

১ "আশ্রমের রূপ ও বিকাশ"

আবেগসুন্দর স্বর আমার কানে বাজছে। ১৯৩৭ সালের ১৩ মার্চ তারিখ। শনিবার। সেদিন রাতে কলকাতার রবিবাসর সমিতির প্রায় চল্লিশ জন সদস্য শান্তিনিকেতনে আসেন। পরের দিন সকাল বেলা 'উত্তরায়ণ'-এ তাঁদের সাহিত্য বৈঠকের অধিবেশন হয়। মহাকবি তখন রবিবাসরের অধিনায়ক। আর জলধর সেন সর্বাধ্যক্ষ।

জলধরবাবু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ আবেগের সঙ্গে ভাষণ শুরু করলেন, বিশ্বের কবি, ভারতের কবি, বাঙলার কবি, আমার কবি—আপনাকে প্রণাম করি। আজ আপনি স্নেহভরে রবিবাসরের অধিনায়করূপে আমাদের এই তীর্থস্থলে আসবার জন্য যে ডাক দিয়েছেন, তাতে আমাদের মন উৎসাহে ও আনন্দে অভিভূত হয়ে গেছে। কবিবর, আমরা কলকাতা থেকে এখানে আসিনি আপনাকে প্রবন্ধ, কবিতা শোনাতে। এত বড় দুর্বুদ্ধি আমাদের হয়নি। কলকাতা থেকে কয়লা নিয়ে আমরা রানীগঞ্জে বিক্রি করতে আসিনি। আমরা এসেছি, এই পবিত্র তীর্থে সমবেত হয়ে নিজেদের পবিত্র করতে আর আপনার মুখের বাণী শুনতে।

অকৃত্রিম শ্রদ্ধার্ঘ্য স্বভাবতঃই উদ্দীপনাময়। চকিতে মহাকবির মন উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। তিনি আবেগভরে ভাষণ শুরু করলেন। বলতে লাগলেন, আজ আপনাদের এখানে আহ্বান করেছি দেখবার জন্য, বোঝবার জন্য যে, আমি কি ভাবে এখানে দিন কাটাই। আমি এখানে ত কবি নই! শান্তিনিকেতন শ্রীনিকেতন কবির ক্ষেত্র নয়। সাহিত্য নিয়ে আমি এখানে কারবার করি না। এখানে আমার কর্মই রূপ পেয়েছে। * * * আমার গত জীবনের আনন্দ, উৎসাহ, সাহিত্য—সবই পল্লীজীবনের আবেষ্টনের মধ্যে গড়ে উঠেছে। জীবনের অনেক দিন নগরের বাইরে পল্লীগ্রামের সুখদুঃখের মধ্যে কেটেছে। তখনই আমি আমাদের দেশের সত্যিকার রূপ কোথায় তা অনুভব করতে পেরেছি। যখন আমি পদ্মানদীর তীরে ডিঙিতে বাস করতাম, তখন আমি গ্রামের লোকেদের অভাব, অভিযোগ

এবং কত বড় অভাগা যে তারা, তা দেখতে পেয়েছিলাম। তা দেখে হৃদয়ে অনুভব করতাম গভীর বেদনা। এইসব গ্রামবাসীরা যে কত বড় অসহায়, সে সময়ে তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলাম। তখন আমি আমার গল্পে, কবিতায়, প্রবন্ধে সেই অসহায়দের সুখদুঃখ ও বেদনার কথা এঁকে এঁকে প্রকাশ করেছিলাম। এ কথা আজ গর্ব করে বলতে পারি, এর আগে বাংলা সাহিত্যে কেউ ওই নিঃসহায় পল্লীর অধিবাসীদের কথা প্রকাশ করেনি।

মহাকবি বলে যান, সেই সময় থেকে আমার মনে এই ভাব জেগেছিল, কেমন করে এই সব অসহায় অভাগাদের প্রাণে মানুষ হবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দিতে পারি? এই যে এরা মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত, এই যে এরা খাদ্য থেকে বঞ্চিত, এই যে এরা একবিন্দু পানীয় জল থেকে বঞ্চিত, এর কি প্রতিকারের কোন উপায় নেই?

একটু থেমে মহাকবি আবার শুরু করলেন, এমনি সময়ে আমার অন্তরের মধ্যে আর একটা প্রেরণা জেগে উঠল। আমার চিত্ত ধাবিত হল নতুন একটা কর্ম-আয়োজনের দিকে। মনে মনে সংকল্প করলাম, শিক্ষার ভিতর দিয়ে সমগ্র দেশের সেবা করব। আমার ভাগ্যদেবতা কেবলই আমাকে ছলনা করেছেন, করুণা করেন নি। তাই তিনি আমাকে নিয়ে এলেন শিক্ষাদান কর্মের মধ্যে। আমার মনে হল, মহর্ষির সাধনক্ষেত্র শান্তিনিকেতনে যদি ছাত্রদের এনে ফেলতে পারি, তবে তাদের শিক্ষা দেবার দায়িত্ব নেওয়া তেমন দুঃসাধ্য হবে না। আমার ভাগ্যদেবতা বললেন, মুক্ত আলোকে প্রকৃতির এই সৌন্দর্যের মধ্যে এদের নিয়ে যদি ছেড়ে দাও, তবেই হবে। প্রকৃতি নিজেই ওদের হৃদয়কে পূর্ণ করে দেবে। কর্মসূচী করতে হবে না, কিছুই ভাবতে হবে না। আমার কবিমন এই নতুন প্রেরণা পেয়ে ব্যাকুল হয়ে উঠল। * * * *[১]

১ ১৯৩৭, ১৬ মার্চ তারিখের "আনন্দবাজার পত্রিকা" দ্রষ্টব্য।

এই বিশ্বাসের উদ্দীপনায় সৃষ্টি হয়েছে শান্তিনিকেতন। আর গড়ে উঠেছে মহাকবির পরম জীবনখানি।

*

* *

বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানুষ রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকবে—যদি আর একটি প্রসঙ্গের উল্লেখ না করি।

আমি যখন তাঁর সান্নিধ্যে এসে হাজির হই, তখন তাঁর বয়স পার হয়ে গেছে বার্ধক্যের আদি সীমা। তবু বারবার দেখেছি, বিশ্ব-প্রকৃতির সংসর্গ সম্বন্ধে আজও তাঁর দেহমন নিত্য-সজাগ। এ বিষয়ে তাঁর ইন্দ্রিয়-বোধ যেমন তীক্ষ্ণ, হৃদয় তেমনই সচেতন।

দৈনন্দিন জীবনেও তিনি পেয়েছেন রহস্যময়ী বিশ্বপ্রকৃতির রঙমহলের সন্ধান। তাই তাঁর চোখে সামান্যও হয়ে ওঠে অসামান্য। তাঁর একটি গানে আছে ঃ

“এই ত ভাল লেগেছিল আলোর নাচন পাতায় পাতায়।
শালের বনে খ্যাপা হাওয়া, এই ত আমার মনকে মাতায়।
রাঙা মাটির রাস্তা বেয়ে হাটের পথিক চলে ধেয়ে,
ছোট মেয়ে ধুলায় বসে খেলার ডালি একলা সাজায়—
সামনে চেয়ে এই যা দেখি, চোখে আমার বীণা বাজায়।”

এ বাণী শুধু তাঁর কাব্যে সার্থক হয় নি, সত্য হয়ে উঠেছে তাঁর দৈনন্দিন জীবনেও। তিনি যে আগ্রহভরে বিশ্বভারতীর কাজকর্মের খোঁজ নেন, হয়ত তার চেয়ে বেশী আগ্রহে তাঁর ‘উত্তরায়ণে’র চার পাশের বিশ্বপ্রকৃতির ছোটখাটো নিত্য-পরিবর্তনের হিসাব রাখেন। ঘরের পাশের বেলফুলের গাছগুলিতে কবে কুঁড়ির আবির্ভাব হল, কবে আমলকী আর শালের বনে শুরু হল পাতা ঝরা, আবার কবে বসন্তের আগমনীর খবর নিয়ে জাগল দক্ষিণী বাতাস—এসব বিষয়ে দৈনিকপত্রের সংবাদ-সংগ্রাহকদের মত তাঁর অনুসন্ধিৎসা।

মনে পড়ে, তাঁর ‘পুনশ্চে’র সামনে চারা অশোক গাছটিতে এক

দিন হঠাৎ একগুচ্ছ লাল ফুলের প্রথম কলি দেখা দিল। বিকালে কাজের উপলক্ষে গিয়ে শুনলুম, তিনি বারান্দায় বসে শ্রীমতী রানী চন্দকে[১] বলছেন, রানী, দেখেছ, অশোক গাছটিতে প্রথম ফুল দেখা দিয়েছে ?

আর একদিনের কথা মনে পড়ে। প্রতি বছরেই শীতের অতিথি হিসাবে আশ্রমের রাঙা মাটির প্রান্তরে এসে হাজির হয় দলে দলে বিদেশী পাখি। সেবার সবেমাত্র কনকনে শীত পড়েছে। একজন তাঁর অন্তরঙ্গ কর্মী কথায় কথায় অনুযোগ করলেন, গুরুদেব, এবছর আশ্রমে অতিথি পাখির দল ত এসে হাজির হল না ? হিমালয়ে কি বরফ পড়া বন্ধ হয়ে গেল ?

মহাকবি মৃদু হেসে বললেন, না, না। আজ সকালেই এক ঝাঁক নতুন পাখিকে দেখেছি শ্যামলীর পিছনে।

শান্তিনিকেতনে গুরুপল্লীর অধিবাসীরা তাঁর প্রিয় প্রতিবেশী। মনে হয়, তাঁর কাছে তেমনি প্রিয় প্রতিবেশী হচ্ছে আশ্রমের গাছ-পালা, আকাশবাতাস, মাঠময়দান আর পাখির দল।

১৯৩৭ সাল, ৫ এপ্রিল। রবীন্দ্রনাথ রয়েছেন তাঁর 'পুনশ্চ' বাড়িটিতে। কিছুদিন আগে থেকে তাঁর "গল্পগুচ্ছে"র সম্পাদনার কাজ আরম্ভ হয়েছে। আমার উপর ভার পড়েছে। ঠিক হয়েছিল, "গল্পগুচ্ছে" যা কিছু শব্দ, যতিচিহ্ন এবং ব্যাকরণের ত্রুটি আছে, তা সব সংশোধন করা হবে। আর পাত্রপাত্রীর সংলাপের ভাষাকে চলতি, মৌলিক কথায় রূপান্তরিত করতে হবে,—যদি সম্ভব হয়।

বাংলাসাহিত্যে ছোটগল্প সৃষ্টি রবীন্দ্রপ্রতিভার একটি বিশিষ্ট দান। বাংলা ভাষায় তিনিই ঠিক ঠিক প্রথম ছোটগল্প লেখেন। আর আজও তিনিই আমাদের শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প-লেখক। বিশ্ব-সাহিত্যের ছোটগল্প বিভাগেও তাঁর আসন খুব উঁচুস্তরে। তাঁর লেখা 'কাবুলিওয়ালা' ত পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প।

১ বিখ্যাত শিল্পী। বিশ্বভারতীর প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অনিল চন্দের স্ত্রী।

তবু একালের বাংলাভাষা পাঠকপাঠিকামহলে তাঁর ছোট গল্পের তেমন আদর নেই। রবীন্দ্রনাথ তা লক্ষ করেছিলেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল, এই অনাদরের একটি কারণ হচ্ছে সংলাপের সাধুভাষা। তাই সেই ভাষাকে যথাসম্ভব বদলাবার ভার আমাকে দিয়েছিলেন।

সেদিন "গল্পগুচ্ছে"র কাজ নিয়ে 'পুনশ্চে' উপস্থিত হয়েছিলুম। বিকাল পাঁচটা হয়ে গেছে। গিয়ে দেখলুম, বারান্দায় শান্তিনিকেতনের একজন কর্মী অপেক্ষা করছেন, আর গুরুদেব গোসলখানায় গেছেন। আমি পাশের বাড়ি 'কোণার্ক'তে এসে গ্রন্থাগারের বই দেখতে শুরু করলুম। কিছুক্ষণ পরে রবীন্দ্রনাথ আমাকে ডেকে না পাঠিয়ে একেবারে 'কোণার্কে'র বারান্দার সামনের পাকা চাতালে এসে উপস্থিত হলেন। সঙ্গে রয়েছেন কর্মী ভদ্রলোক। তিনি তাড়াতাড়ি বেতের চেয়ার আনিয়ে বসার আয়োজন করে দিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ফাঁকা জায়গায় বসে "গল্পগুচ্ছে"র কাজ পরীক্ষা করতে লাগলেন। আবহাওয়ায় বেশ একটি গুমটের ভাব ছিল। গাছের পাতাগুলো একটুও নড়ছিল না। আকাশটা ঘোলাটে।

আমি কাজের ফাঁকে ফাঁকে আলোচনা করতে লাগলুম। জিজ্ঞাসা করলুম, "গল্পগুচ্ছ" প্রথম খণ্ডের 'ঘাটের কথা' আর 'রাজপথের কথা' আপনার ছোটগল্প রচনার প্রথম চেষ্টা। এগুলি ঠিক পুরোপুরি ছোটগল্প হয়নি। কিন্তু আপনার চতুর্থ রচনা 'পোস্ট মাস্টার' একেবারে খুব উঁচু শ্রেণীর ছোটগল্প হয়েছে। আপনি এই টেকনিক কোথায় পেয়েছিলেন? আপনি কি তখন মোপাসাঁর লেখা পড়েছিলেন?

মহাকবি উত্তর দিলেন, সব কথা এখন মনে পড়ছে না। তবে ফরাসী লেখক মোপাসাঁ বা অন্যান্যদের লেখা আমি পড়েছি অনেক পরে। "হিতবাদী" প্রকাশের সময় তার কর্তৃপক্ষেরা বললেন, আপনাকে গল্প দিতে হবে আমাদের কাগজে। আমি তখন থাকি শিলাইদা বা পতিসরে। গ্রামে গ্রামে যা দেখতাম, তা-ই নিয়েই

গল্প লিখলাম। কিন্তু একথা ঠিক, মোপাসাঁর লেখা পড়ে সে সব গল্প লিখিনি।

আমি আরও প্রশ্ন করলুম, যতদূর খবর পেয়েছি, তাতে মনে হয়, আগে এক সময়ে আপনি ডিকেন্‌স আর জর্জ এলিয়ট খুব পড়তেন।

তিনি স্মৃতি-অবগাহনের ভঙ্গীতে মুখ তুলে জবাব দিলেন, হ্যাঁ, এঁদের বই খুব পড়তাম। তবে ইংরেজ নভেলিস্টদের মধ্যে আমার সব চেয়ে প্রিয় ছিলেন মেরিডিথ। চরিত্রের মানসিক দ্বন্দ্বের ছবি ওঁর লেখায় বেশ আছে। তবে এইসব ইংরেজ কথাশিল্পীরা খুব ভাল ছোটগল্প লেখেন নি। যা-বা লিখেছেন, তা বড় গল্পকে ছোট করা। তুমি ত জান, ছোটগল্পের টেকনিক একেবারে অন্য জাতের।

হঠাৎ কাল বোশেখির ঝড় উঠল। যে চাতালে আমরা বসে-ছিলুম, তার ছাদ ছিল, কিন্তু তিন দিক ছিল একেবারে খোলা। দক্ষিণ পাশে দাঁড়িয়েছিল একটি বড় শিমূল গাছ। দেখতে দেখতে ঘূর্ণির ধুলোয় আকাশ কাল হয়ে গেল। শুকনো পাতার সশব্দ ছোটাছুটিতে চারিদিক হয়ে উঠল মুখর।

আমি ব্যস্ত হয়ে পড়লুম, সেই বিপর্যয়ের মধ্যে মহাকবিকে ঘরের মধ্যে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলুম। তিনি আমাকে ইংগিতে চুপ করে বসে থাকতে বললেন।

আমি ভাল করে তাঁর দিকে তাকাতেই বুঝতে পারলুম, তখন তিনি ঊর্ধ্বমুখে একদৃষ্টে আকাশের দিকে চেয়ে রয়েছেন। চশমার ভিতরে তাঁর চোখ দুটি অপূর্ব বিস্ময়ে ভরা। রবীন্দ্রনাথ যেন একেবারে বদলে গেছেন। কিছুক্ষণ আগের মানুষ বলে যেন আর তাঁকে চেনা যায় না। বাইরের ঝড়ের দোলা গিয়ে লেগেছে তাঁর মনের গহন বনে।

ক্রমে ঘূর্ণি উঠল ঘনিয়ে। পাগল হাওয়া রুদ্র মাতনে দিক্‌বিদিগ আচ্ছন্ন করে ফেললে। 'কোণার্ক' থেকে শ্রীমতী চন্দ ছুটে এলেন।

কিন্তু ভাবগতিক দেখে তিনি আর মহাকবিকে বিরক্ত করলেন না, তাঁর চেয়ারের পাশে রকের উপর বসে একমনে ঝড় দেখতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে মহাকবি একেবারে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। মাঝে মাঝে শুধু চোখের দৃষ্টি এদিকে-ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আর তিনি যেন সমস্ত সত্তা দিয়ে কোন্ অজানা রুদ্র পুরুষের দুর্মদ গতি পর্যবেক্ষণ করছিলেন।

অপরূপ সে দৃশ্য। কিছুক্ষণ পরে মনে হল, রবীন্দ্রনাথের স্থির, নিশ্চল দেহ পড়ে আছে 'কোণার্কে'র চাতালে। আর তাঁর ধ্যানমগ্ন কবি-সত্তা চলে গেছে দূর আকাশের কোলে। সেখানে রুদ্রের বৈশাখী নৃত্যের তালে তালে তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছে লোক থেকে লোকান্তরে।

*

* *

আর এক দিনের কথা মনে পড়ে। সেদিন বিকালে রবীন্দ্রনাথ বসেছিলেন উদয়নের দক্ষিণ-পূর্ব দিকের কোণের ঘরের বারান্দায়। "বাংলাকাব্য পরিচয়" সম্বন্ধে কাজ শেষ হলে সুযোগ বুঝে "শেষের কবিতা"র কথা তুললুম।

জিজ্ঞাসা করলুম, আপনার দু-একজন ভক্তদের মুখে শুনেছি, আপনি নাকি কোন একজনের কাছে বলেছেন, "শেষের কবিতা" হালকাভাবে লেখা?

রবীন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন, যারা একথা বলেছে, "শেষের কবিতা"র কিছুই বোঝেনি তারা। অমিত গভীর কথা হালকাভাবে বলত। সে নিজে হালকা মানুষ ছিল না। বইখানা হালকাভাবে একটুও লিখিনি।

আমি ভয়ে ভয়ে বললুম, কি জানি, গুরুদেব। শুনেছি, আপনি নাকি অমিতের চরিত্র আপনার একজন অন্তরঙ্গ প্রিয়জনকে ব্যঙ্গ করে এঁকেছেন।

—কে সেই প্রিয়জন ?

উত্তর দিলুম, কারো মুখে শুনি, সেই প্রিয়জন হচ্ছেন অধ্যাপক অপূর্ব চন্দ। আবার অন্যেরা নাম করেন কবি সুধীন দত্তের।

রবীন্দ্রনাথ অসহিষ্ণু হয়ে উত্তর দিলেন, সম্পূর্ণ বাজে কথা ওসব। কেউ কেউ আবার নাকি বলে, অমিত আমি নিজেই। তারা অমিত চরিত্রকে মোটেই ধরতে পারেনি। ওদের কথা শুনো না। অপরের নামে দেশের লোক সব কথা চালাতে পারে।

বইখানা সম্বন্ধে আরও কথা শোনার আগ্রহে আর একটি প্রসঙ্গ শুরু করলুম। প্রশ্ন করলুম, অমিত শেষে কেতকীকে বিয়ে করলে কেন ?

মহাকবি বলতে লাগলেন, অমিত শেষ পর্যন্ত দেখলে লাবণ্যকে সে কিছুতেই পাবে না। অথচ কেতকীকে সে একদিন সত্যিই ভালবেসেছিল। তারপর ঘটনাচক্রে সে মোহ তার দূর হয়ে যায়। কেতকী কিন্তু অমিতকে ভোলেনি। সে দীর্ঘদিন মনে মনে বহন করে এসেছিল প্রেমের বেদনা। সেই বেদনার কথা অমিত যখন জানতে পারলে, তখন তার মনে পুরাতন প্রেম আবার নতুন আকর্ষণ নিয়ে জেগে উঠল। অমিত লাবণ্য ও কেতকী তুজনকেই ভালবাসত। কিন্তু তুজনের কাছ থেকে সে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের প্রতিদান আশা করত। কেতকীর কাছ থেকে সে চাইত সেবা, শুশ্রূষা—সংসার জীবনে পুরুষ মেয়েদের কাছ থেকে যা চায়। কিন্তু লাবণ্যের কাছ থেকে তার মন প্রত্যাশা করেছিল সঙ্গ। অমিতের পক্ষে তার তু ভালবাসাই সত্যি। আমরা অনেক সময়ে কয়েকটা মন-গড়া ধারণা নিয়ে সাহিত্যের মধ্যে তত্ত্ব-আলোচনা করতে চাই, তাই সব পণ্ড হয়। কোন্ ভালবাসা বড়, কোন্‌টা ছোট—সে বিচার লেখকের নয়। উচিত-অনুচিতের দ্বন্দ্ব নিয়ে আর নিছক তত্ত্ব আলোচনা করে যারা মরে, তারা জীবনকে চায় না, জীবনকে বুঝতেও পারে না।

ইতিমধ্যে বাইরের আকাশে ঘনঘোর হয়ে মেঘ জমেছে। দেখতে দেখতে তু-একটা বড় বড় ফোঁটার সঙ্গে সশব্দে শুরু করে দিলে

অবেলার বর্ষণ। চকিতে মহাকবির মন সাড়া দিলে বিশ্ব-প্রকৃতির ডাকে। তিনি বার বার সতৃষ্ণ নয়নে আকাশের দিকে চাইতে লাগলেন।

আমাদের আলোচনা ক্রমশঃ এক উপন্যাস থেকে আর এক উপন্যাসে গড়িয়ে চলল। রবীন্দ্রনাথ "নৌকাডুবি"র প্রসঙ্গে বলতে লাগলেন, "নৌকাডুবি" আর "চোখের বালি"র মধ্যে সাইকোলজি-ক্যাল দ্বন্দ্ব নেই। "চোখের বালি"তে তবু বিনোদিনী ও মহেন্দ্র চরিত্রের মধ্যে যাও-বা কিছু দ্বন্দ্ব আছে, "নৌকাডুবি"র মধ্যে ত একেবারেই কিছু নেই। সেকালের পাঠকদের প্রচলিত সেনটি-মেন্টের বেদীতলে বইখানার প্লটকে অনেকটা বলি দেওয়া হয়েছে।

একটু থেমে তিনি আবার শুরু করলেন, আজ যদি উপন্যাসখানা লিখতাম, তাহলে নিশ্চয়ই কমলা চরিত্রে একটা দ্বন্দ্ব স্থান পেত। ওর মত বয়সে কমলা যে অবস্থার মধ্যে পড়েছিল, তাতে তার পক্ষে রমেশকে ভালবাসাই স্বাভাবিক। অথচ যখন সে শুনলে, রমেশ তার স্বামী নয়, তখন তার হৃদয়ের সংস্কারবোধ এক নিমেষে তাকে ফিরিয়ে দিলে স্বামীর দিকে। এতে তার মনে একটুও দ্বন্দ্ব উঠল না। যাকে চেনে না, জানে না, তাকে স্বামী বলে গ্রহণ করতে তার ভিতরে একটুও দ্বিধা জাগল না। বাস্তব জীবনে এ কি সম্ভব? "নৌকাডুবি"র প্লটটা নিতান্ত সেকেলে।

আলোচনা ক্রমে ক্রমে পৌঁছল "যোগাযোগ" উপন্যাসে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, বইখানার শেষ দিকে কুমু এত বিদ্রোহের পর নিঃশব্দে শ্বশুরবাড়ি ফিরে গেল। লোকে বলে, কুমুর পরিণতি আঁকতে গিয়ে আপনি সমাজের প্রাচীন-পন্থীদের মতকেই সমর্থন করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের মন তখন পুরোপুরি আকৃষ্ট হয়েছে মুখর বর্ষণের দিকে। তবু তিনি আকাশের দিকে চেয়ে বলতে লাগলেন, প্রাচীন-পন্থীদের সমর্থন আমি মোটেই করিনি। কিন্তু সন্তান সম্ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের মনে যে একটা ইনটেনস্ ফীলিং—গভীর অনুভূতির আবেগ জেগে ওঠে, তার কাছে সংসারের আর সব বিচার

ছোট হয়ে যায়। মেয়েদের সেই তীব্র আবেগের সত্যিকার রূপটি আমরা পুরুষেরা ঠিক ধরতে পারি না।

ইতিমধ্যে শান্তিনিকেতন আশ্রম ঘিরে বাদল-বাউলের একতারা বেজে উঠেছিল। দূরে শাল আর আমলকীর ডালে ডালে উদাসী, ভিজে হাওয়া শুরু করেছিল অকালের মাতন। "পাতায় পাতায় টুপুর টুপুর নূপুর মধুর বাজে।"

মহাকবি আলোচনা বন্ধ করলেন, তন্ময় হয়ে বিশ্বপ্রকৃতির সেই লীলা দেখতে লাগলেন। তাঁর মুখের উপরে ধীরে ধীরে ভেসে উঠল একটা অজানা প্রসন্নতা। মনে হল, দৃষ্টি তাঁর বাইরে কিন্তু লক্ষ বুঝি আর বাইরের দিকে নয়। তাঁর অঙ্গে অঙ্গে যেন অন্তর্মুখী তন্ময়তার পুলক স্পর্শ।

সেই অবস্থায় তাঁকে দেখতে দেখতে হঠাৎ আমার মনে পড়ল তাঁর লেখা গানখানি ঃ

"শালের বনে থেকে থেকে ঝড় দোলা দেয় হেঁকে হেঁকে,
জল ছুটে যায় এঁকে বেঁকে মাঠের পরে।
আজ মেঘের জটা উড়িয়ে দিয়ে নৃত্য কে করে॥
ওরে বৃষ্টিতে মোর ছুটেছে মন, লুটেছে এই ঝড়ে—
বুক ছাপিয়ে তরঙ্গ মোর কাহার পায়ে পড়ে।
অন্তরে আজ কি কলরোল, দ্বারে দ্বারে ভাঙল আগল—
হৃদয় মাঝে জাগল পাগল আজি ভাদরে।
আজ এমন করে কে মেতেছে বাহিরে ঘরে॥"

আমার ধারণা, রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনে physical enjoyment of nature—তাঁর বাহ্য ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি-রতি—অসামান্যভাবে বিকাশ পেয়েছে। তাই তাঁর এই চরম ভোগানন্দের রসাবেগ বাংলাসাহিত্যে সৃষ্টি করতে পেরেছে অপরূপ ধ্বনি ও ব্যঞ্জনাময় কতকগুলি সেরা গান আর কবিতা। কালে তারা হবে বিশ্বজনের চির-আদরের ধন।

॥ তিন ॥

রবীন্দ্রনাথ খাওয়া সম্বন্ধেও একান্ত সূক্ষ্ম রুচির মানুষ। আমাদের দেশে প্রতিভাবান পুরুষ জীবনের বাইরের দিকটা সম্বন্ধে প্রায়ই উদাসীন থাকেন। মহাকবির দৃষ্টিভঙ্গী কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি 'খাওয়া'কে শুধু খাওয়া মনে করেন না। তাঁর চোখে খাওয়া শুধু দেহপুষ্টির প্রাত্যহিক স্থূল প্রয়োজন নয়। আবার নিছক মন-তুষ্টির বিলাসও নয়। সম্ভবতঃ তার ধারণা, খাওয়ার সঙ্গে শারীরিক স্বাস্থ্য এবং মানসিক সতেজতা রক্ষার অতি নিবিড় যোগ আছে। একে অবহেলা করা মানে শরীর ও মনকে অনাদর করা। বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথের আছে বিজ্ঞানসাধকের মত প্রখর দৃষ্টি আর অনুসন্ধিৎসা।

তিনি নিজে খেতে ভালবাসেন। বিদ্যাসাগরের মত অপরকে খাওয়াতেও ভালবাসেন। পৃথিবীর সকল দেশেই বেশির ভাগ মানুষের জীবনে যা চরম স্থূলতার ব্যাপার, তিনি সেই খাওয়াকে কোন এক সময় কত সূক্ষ্ম এবং শিল্পময় করে তুলেছিলেন, তা একখানা পারিবারিক চিঠি থেকে বোঝা যায়।

এক সময়ে শ্রীমতী প্রতিমা দেবীকে নিজের দৈনন্দিন জীবনের কর্মতালিকা দিতে গিয়ে লিখছেন, "ভোরে তিনটের সময় উঠে স্নান করি মাথায় গায়ে সরষে বাটা মেখে। আলো যখন হয়, চায়ের সরঞ্জাম আসে। মস্ত একডালা মাখন খাই চিনি সহযোগে। চীনে চায়ের সঙ্গে আসে দু তোষ-রুটি ।*** বেলা সাড়ে দশটার সময় আমার মাধ্যভোজন—একেবারে বিশুদ্ধ হবিষ্যান্ন আতপ চালের সফেন ভাত, আলুসিদ্ধ, কচুসিদ্ধ। কোন কোনো দিন অতি সভয়ে খেয়ে থাকি তোমারই বাগানে উৎপন্ন ওলসিদ্ধ। সঙ্গে থাকে এক পাইন্‌ট ঘোল। তিনটের সময়ে বাগানের আতা এবং আঙুরের রস। ছটার সময় ভূষি সমেত আটার দুইখান রুটি সিদ্ধ আলু ভাজা সংযোগে, এক পেয়ালা দুধে কিঞ্চিৎ ফলের রস মিশিয়ে ।***"

বলা বাহুল্য, এই এক তালিকা অনুযায়ী প্রতিদিন তাঁর খাবার তৈরী হয় না। দিনে দিনে মেনু বদলায় স্বাদে এবং প্রকারে। তাছাড়া তিনি জীবনের পর্বে পর্বে খাদ্য নিয়ে বিচিত্র পরীক্ষার আয়োজন করেছেন।

শুনেছি, আমিষ খেতে তিনি পছন্দ করেন না। কিন্তু নিরামিষের চেয়ে আমিষ খেলে তাঁর শরীর ভাল থাকে। ফল তার খুব প্রিয় জিনিস, বিশেষতঃ আম। মিষ্টির মধ্যে সন্দেশ খেতে ভালবাসেন। সুবিধা থাকলে তাজা গুড় এবং চাকভাঙা মধু নিয়মিত খান। দেখেছি, শান্তিনিকেতন আশ্রমে শীতকালের ভোরবেলা খেঁজুর রস তাঁর প্রায় নিত্য পানীয় ছিল।

রবীন্দ্রনাথ খাদ্য নিয়ে সুদীর্ঘ জীবনে বার বার পরীক্ষা করেছেন। এ বিষয়েও গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর তুলনা করা যায়। তবে খাদ্যের মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দুজনের ধারণা হয়ত এক নয়। গান্ধীজীর জন্ম জৈন পরিবারে। তাঁর জীবনসাধনার মূলে আছে জৈন তাপসদের কৃচ্ছ্রসাধনার আদর্শ। মনে হয়, তিনি খাদ্যকে প্রাণধারণের নিতান্ত অপরিহার্য স্থূল প্রয়োজন ছাড়া আর কিছু ভাবেন না এবং 'ক্যালরি' মূল্যের বিচারেই প্রধানতঃ খাদ্য নির্বাচন করেন।

অবশ্য স্বীকার করি, মানুষের দেহের পুষ্টি নির্ভর করে খাদ্যের 'ক্যালরি' ভ্যালুর উপর। কিন্তু মনের তৃপ্তির জন্য কি খাদ্যের রসাস্বাদন অপরিহার্য নয়?

যাহোক, রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি খাদ্যপরীক্ষার গল্প খুবই মজার। শুনেছি, এক সময়ে তাঁর ধারণা হয়েছিল, মশলা না দিয়ে শুধু সিদ্ধ-করা খাবার মানুষের খাওয়া দরকার। তাতে স্বাস্থ্য ভাল থাকে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে নিজের উপর পরীক্ষার কাজ শুরু করলেন। পেঁপে, কপি, গাজর, মূলো সিদ্ধ রোজ খেতে লাগলেন। প্রথম প্রথম শরীর বেশ দুর্বল হয়ে পড়ল। কিন্তু সারাদিন যথারীতি কঠোর পরিশ্রম করতে ছাড়লেন না।

আর একবার তিনি শুরু করলেন রান্না-না-করা, কাঁচা শাকসবজি খাওয়া। তখন তাঁর কোন খাবারই উনুনে চড়ানো হত না। তিনি দুবেলা কাঁচা সবজি কেটে নুন মরিচ দিয়ে মেখে মহানন্দে আহার পর্ব সমাধা করতেন। শোনা যায়, আর এক সময় কিছুদিন রেড়ির তেলের ময়েন-দেওয়া রুটি খেতেন।

আরও একটা পরীক্ষার গল্প শ্রীমতী নন্দিতা কৃপালনীর[১] মুখে শুনেছি। মহাকবি সেবার ভাততরকারি, মাছমাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। শুধু ছাতু, নাড়ু, রুটি, খই, মুড়ি খেতেন। কিছুদিন পরে এই পরীক্ষার ফল বিষম হয়ে উঠল। রবীন্দ্রনাথের রোজ বদহজম হতে লাগল। পরিবারের লোকেরা জোর করে বলতে লাগলেন, এবার ছাতু খই ছাড়ুন। নাহলে শরীর যে একেবারে যাবে! ক্রমে তাঁদের অনুরোধ পীড়াপীড়িতে পরিণত হল। তখন মহাকবি আবার সাধারণ ভাত তরকারি খাওয়া আরম্ভ করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজের পরীক্ষা সম্বন্ধে বিশ্বাস ছাড়লেন না। বললেন, এ রকম খাওয়া ছাড়লাম বটে। কিন্তু এতে প্রমাণ হল যে, এ ধরনের খাওয়া ভুল। যদি কিছু প্রমাণ হয়ে থাকে, তা এই মাত্র যে, এ সময়ে আমার দেহযন্ত্রে এ ধরনের খাওয়া সহ্য হল না।

বিশেষ বিশ্লেষণ করে দেখলে মনে হয়, এই সব পরীক্ষার মূলে নেই শুধু বিজ্ঞানীর মত খাদ্যমূল্য নিরূপণ করার চেষ্টা। মহাকবি শিল্পসাধনার ক্ষেত্রের মত ব্যক্তিগতজীবনেও চান বিচিত্রকে আস্বাদন করতে। তিনি ভোজনবিলাসী নন, কিন্তু তাঁকে ভোজ্যবিলাসী বলা যেতে পারে। বিচিত্র ভোজ্যের সাহায্যে দৈনন্দিন জীবনের একটি নিতান্ত স্থূল কাজকে আকর্ষণহীন, নিছক অভ্যাসে পরিণত হতে দেন না।

তাঁর নিমের শরবত খাওয়ার সঙ্গে একটি হাসির কাহিনী জড়িত হয়ে আছে। তখন তিনি ভাতে শুকনো নিমপাতা খেতেন। তাঁর

১ বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী। রবীন্দ্রনাথের নাতনি।

তরকারিতে শুকনো নিমপাতার গুঁড়ো ছড়িয়ে দেওয়া হত। দুপুরের খাওয়া শুরু করার আগে এক গ্লাস কাঁচা নিমপাতার শরবত ছিল তাঁর নৈমিত্তিক পানীয়। এই সময়ে একদিন নাকি একজন ভদ্রলোক নিমন্ত্রিত হয়ে মহাকবির সঙ্গে খেতে বসেছিলেন। দুজনকেই সব রকম খাবার ভাগ করে টেবিলে দেওয়া হয়েছিল।

ঠিক খাওয়া শুরু হবার আগে চাকর এসে মহাকবিকে এক গ্লাস সবুজ রঙের শরবত দিয়ে গেল। সঙ্গী ভদ্রলোক তা দেখে খুব কৌতূহলী হলেন। ভাবলেন, এ একটা না জানি কি রহস্যময় পানীয়। নিশ্চয়ই সিদ্ধির শরবত বা তেমন কিছু নেশার জিনিস হবে।

লোকচরিত্র বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের আছে তীক্ষ্ণ, সহজ-বোধ। তিনি আগন্তুকের ভাবখানা দেখে সব বুঝতে পারলেন। তাই হাসি চেপে কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন, এইত দেখ, কি ভীষণ পক্ষপাতিত্ব। আমি এসব একদম পছন্দ করি না। একসঙ্গে খেতে বসেছি, অথচ দেখ, রবীন্দ্রনাথ বলে খাতির করে আমাকে এক প্রস্থ বেশী দেওয়া হল। ওরে, দে দে বাবুকেও এক গ্লাস শরবত এনে দে।

দ্বিতীয় গ্লাস শরবত এলে ভদ্রলোক তাতে মুখ দিয়ে চমকে উঠলেন। বুঝতে তাঁর দেরি হল না যে, এ সিদ্ধি নয়, বাটা নিমপাতা।

গান্ধীজী সারাজীবন সত্য নিয়ে একসপেরিমেন্ট করছেন। রবীন্দ্রনাথ করছেন জীবনের বিচিত্র লীলার সন্ধানে বিচিত্র পরীক্ষা।

*

* *

আগেই বলেছি, মহাকবি অতিথি, আগন্তুক বা আশ্রমকর্মীদের বিশেষ যত্ন করে খাওয়ান। একটি দিনের কথা আমার মনে এখনও তাজা হয়ে আছে, হয়ত বহুদিন থাকবেও।

শান্তিনিকেতনের উৎসব সভায় মহাকবি

শান্তিনিকেতনের মন্দিরের পাশে
গ্রন্থকার

রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত "বাংলাকাব্য পরিচয়"-এর পাণ্ডুলিপি রচনার কাজ তখন প্রায় শেষ হয়েছে। এ কাজে গোড়া থেকে তাঁকে সাহায্য করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

এই সময়ে একদিন হঠাৎ খুব ভোরবেলা তাঁর কাছ থেকে ডাক এল। তখন তিনি 'পুনশ্চে'র সামনের চাতালে বসেছিলেন। আমি গিয়ে হাজির হতেই রবীন্দ্রনাথ বললেন, কাল সন্ধ্যেবেলা থেকে তোমার খোঁজে সকলে হয়রান। কোথায় ছিলে তুমি? "কাব্য-পরিচয়"-এর ভূমিকাটি লিখে শেষ করেছি, পড়ে দেখত, তোমার কি রকম লাগে।

পড়তে লাগলুম। তিনি লিখেছিলেনঃ "এই সংকলন গ্রন্থকে আমি বাংলাকাব্য পরিচয় নামদিয়েছি। মাইকেল মধুসূদন লিখেছেন, 'বিরচিব মধুচক্র'। প্রত্যেক জাতির কাব্যসাহিত্য তার মধুচক্র। এই মৌচাকের সঞ্চয়ের মধ্যে থাকে তার একটি বিশেষ পরিচয়, সে জানিয়ে দেয় বিশ্বজগতে কোন্ কোন্খানে তার মন খুঁজে পেয়েছে আপন মধু। তার এই মৌচাকে জমা হয় শরৎ বসন্ত বর্ষার বিচিত্র দান। 'মধু দ্যৌঃ', 'মধুমৎ পার্থিবং রজঃ'—আকাশে আছে মধু, পৃথিবীর ধূলিও মধুময়,—মন মধু আহরণ করে স্বপ্ন থেকে আকাশ-কুসুমের মধু, পৃথিবীর ধূলিও ভুঁইচাঁপা ফোটায়, তার থেকেও মধুর সন্ধান মেলে। বাঙালী কি পেয়েছে, কি চেয়েছে, যার মধ্যে আছে অনির্বচনীয়ের স্বাদ, যাকে সে আপন অন্তরের রসে মিশিয়ে স্থায়িত্ব দেবার চেষ্টা করেছে, এইটি পাওয়া যায় তার কাব্য থেকে। পদ্মও হতে পারে তার আকাঙ্ক্ষিত মধুর আধার, গ্রামের পথপার্শ্বে ভাঁটি ফুলও হতে পারে।***

"যাঁরা বাংলাকাব্যসাহিত্যের ইতিহাস অনুসরণ করেছেন, তাঁরা নিঃসন্দেহে একটা কথা লক্ষ করে থাকবেন যে, এই সাহিত্য দুইভাগে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। এর দুই ধারা দুই উৎস থেকে নিঃসৃত। আধুনিক বাংলা কবিতার উৎপত্তি ইওরোপীয় সাহিত্যের অনুপ্রেরণায়,

তাতে সন্দেহ নেই। এই নিয়ে অপবাদ দেওয়া হয় যে, এসব জিনিস ন্যাশন্যাল নয়। তার মানে যদি এই হয় যে, এসব কাব্য স্বভাবতঃই বাঙালী জাতির রুচিবিরুদ্ধ, তাহলে ত এ জমিতে স্বতঃই উঠত না এর অঙ্কুর, উঠলেও শিকড়সুদ্ধ দুদিনে যেত শুকিয়ে। বলা বাহুল্য, তার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। আলু ফসলটা আদিম উৎপত্তি হিসাবে ন্যাশন্যাল নয়, কিন্তু ন্যাশন্যাল জমিতে এর প্রচুর চাষ চলছে এবং ন্যাশন্যাল ভোজে সাবেক দিশি মেটে আলু জাতীয় ভোজ্যকে বহুগুণে গেছে ছাড়িয়ে। ন্যাশন্যাল কুলশীলের দোহাই দিয়ে সেকালের পাঁচালি কবিতার যতই গুণকীর্তন করি না কেন, কোন দেশাত্মবোধী সব ছাড়িয়ে বিশেষভাবে পাঁচালিই ন্যাশন্যাল বিদ্যালয়ে চালাবার হুকুম করেন না। নদীর স্রোত আপন পথ আপনিই কেটে নেয়, রাজকীয় বিভাগের খাল কাটা পথ তার পথ নয়। আধুনিক কাব্য আপন বেগেই দেশের চিত্তে আপনার পথ গভীর ও প্রশস্ত করে নিচ্ছে।

"বঙ্কিম একদিন দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ নিয়ে নিবেদন করেছিলেন বাংলাভাষা ভারতীকে। বলা বাহুল্য, তার ভাব, তার ভঙ্গী, তার ছাঁচ ইংরেজী সাহিত্যের অনুবর্তী। পণ্ডিতেরা তার ভাষারীতিকে বিদ্রূপ করেছেন, সমাজবাদীরা তাকে নিন্দা করেছেন এই বলে যে, সামাজিক রীতিপদ্ধতি থেকে এইসব গল্প দেশের মন ভুলিয়ে নিয়ে তাকে অশুচি করে তুলেছে। কিন্তু দেখা গেল, প্রবীণ নিষ্ঠাবতী গৃহিণীরাও পুত্রবধূদের অনুরোধ করতে লাগলেন এই সব বই তাঁদের পড়ে শোনাতে। বটতলার ছাপা পুরাণ-কথা থেকে তাঁদের দড়ি দিয়ে বাঁধা চশমা ক্রমশঃই পথান্তরিত হয়েছে। এ সমস্ত বিদেশী আমদানি ভাল লাগা উচিত নয় বলে এদের প্রতি অরুচি জন্মাতে কেউ পারলে না।

"সকলের চেয়ে দুঃসাহসিকতা দেখালেন আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের প্রথম দ্বারমোচনকারী মাইকেল মধুসূদন। তিনি যে

মিলটনী বন্যায় দুরূহ শব্দতরঙ্গে বাংলাভাষা তরঙ্গিত করে তুললেন, তার মত অপরিচিত, অনভ্যস্ত আবির্ভাব বাঙালী পাঠকের কাছে আর কিছুই ছিল না। এ যদি সত্যই সম্পূর্ণ অভূতপূর্ব হত, তাহলে এ জিনিসটাকে বাঙালী সর্বান্তঃকরণে ঠেলা মেরে সরিয়ে দিত। কিন্তু নতুন শিক্ষার জোরে ইংরেজী সাহিত্যরসে বাঙালীর তখন মৌতাত জমে গেছে। তখনকার ইংরেজী বিদ্যায় পরিপক্ক বাঙালীর কাছে মিলটন, শেক্‌সপীয়রের আদর আজকের দিনের চেয়ে অনেক বেশী ছিল। তাই বাংলাভাষার যন্ত্রে মিলটনীয় মীর মূর্ছনায় মুগ্ধ হয়ে তারা বাহবা দিয়ে উঠল। মধুসূদনের অসামান্য প্রতিভায় বাংলাভাষার কাব্যরঙ্গভূমিতে প্রথম প্রাচ্যপাশ্চাত্যের মিলন ঘটা সম্ভব হল।

"বাংলাসাহিত্যে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রবর্তনা যে এত দ্রুতগতিতে নানা পথে নানা রূপ নিয়ে এগিয়ে চলেছে, তার কারণ সেই সাহিত্যের আদর্শ হঠাৎ বাঙালীর মনকে বাঁধা গণ্ডি থেকে মুক্তি দিয়েছে। তার মধ্যে একটা কৌতূহলী প্রাণশক্তি আছে, যা নব নব পরীক্ষার পথে আপনাকে নতুন করে আবিষ্কার করতে উদ্যত। সে চিরাগত প্রথার বাধার উপর দিয়ে বারে বারে উদ্বেল হয়ে চলেছে। এই প্রাণশক্তির জীয়নকাঠি একদিন সমুদ্র .ার হয়ে বাংলাভাষাকে স্পর্শ করলে। বন্দিনী যেন দ্রুত সাড়া দিয়ে জেগে উঠল। ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশে এমন ঘটেনি। তারপর থেকে বাঙালীর ভাবপ্রবণ মনের পরিপ্রেক্ষণিকা সাহিত্য-সৃষ্টিতে বিস্তীর্ণ হয়ে গেল; আজ তার রচনাধারা নানা শাখায় দিগন্ত উত্তীর্ণ হয়ে চলেছে। এই জাগরণের যুগে বাঙালী চিত্তের সৃষ্টিক্ষেত্রে যে সকল রসরূপের উদ্ভাবন হয়েছে, এই সংকলন গ্রন্থে তার আকার ও প্রকারের পরিচয় পাওয়া যাবে। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা এই যে, দেখা যাবে তার সৃষ্টি প্রয়াসের আবেগ। কেননা, যে-সৃষ্টি প্রাণবান মনের, কোন একটিমাত্র ঋতুতে তার ফুলের শেষ ফসল অবসিত হয় না। নূতন ঋতু আসবে, নূতন রূপের বিকাশ হবে—এই আশ্বাসবাণী আমাদের পাওয়া চাই। নূতন

আবির্ভাবের ভালমন্দর বিচার পাকা হতে দেরি ঘটে। আমাদের শাস্ত্রে বলে, মানুষ এক জন্মের দেহ ত্যাগ করে, ফের গ্রহণ করে আর জন্মের দেহ। তেমনি মানুষের মন একালের সংস্কার পেরিয়ে বাঁধা পড়ে আর এককালের সংস্কারে। যাকে সে আধুনিক বলে, সেও তার নতুন খোলোস, সে খোলোসও জীর্ণ হয়। পর্বে পর্বে প্রাণ আপন আবরণ যেমন রচনা করে, তেমনি মোচনও করে।***"

ভূমিকার শেষ অংশে মহাকবি আমার নাম উল্লেখ করে লিখে-ছিলেন, "এই গ্রন্থে কবিতার সংগ্রহ কার্যে স্নেহাস্পদ শ্রীযুক্ত কানন বিহারী মুখোপাধ্যায় প্রভূত সাহায্য করেছেন। নতুবা এই দায়িত্ব বহন করা আমার পক্ষে অসাধ্য হত।"

আমার নামোল্লেখ দেখে খুশী হলুম। তবু সবিনয়ে আসল কথাটা তাঁকে জানাতে চেষ্টা করলুম, বললুম, কাব্যপরিচয়ের কাজে আমার বিশেষ কৃতিত্ব নেই। আমি আপনাকে দিয়ে নানা কৌশলে কাজ করিয়ে নিয়েছি মাত্র। আমার নাম না দিলেও চলত।

মহাকবি মৃদু হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন, তবে তোমার নাম কেটে দিই, কি বল?

তারপর পাশের দরজার দিকে ফিরে ডাকলেন, এই।

চাকর মহাদেব প্রস্তুত হয়েই হয়ত অন্তরালে ছিল। তখনই এসে হাজির হল। হাতে তার একটা প্রকাণ্ড গ্লাস।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, গ্লাসটা কাননের হাতে দে।

আমি প্রথমে বুঝতে পারিনি। তাই একটু দুষ্টুমি করে জিজ্ঞাসা করলুম, গ্লাসে কি, গুরুদেব? আপনার সম্বন্ধে যে গল্প শুনেছি, সেই রকম নিমের শরবত নয় ত?

তিনি হাসতে হাসতে বললেন, আগে খাও না। খেয়েই দেখনা, কিসের শরবত।

মহাদেব একটু কিন্তু-মিন্তু হয়ে তাঁকে জানালে, বনমালী বলছে, আপনার জন্য আর নেই। আজ রস কম দিয়ে গেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠিক সেই মুহূর্তে এই রকম আপত্তির কথা আশা করেন নি। পাছে আমি একথা শোনার পর গ্লাসটা হাতে করে না নিই, তাই তিনি পীড়াপীড়ির ধরনে বারবার বলতে লাগলেন, তুই গ্লাসটা আগে কাননের হাতে দেনা,—দে বলছি।

বুঝলুম, এ অবস্থায় গ্লাসটা না নিলে তাঁর বেশী সংকোচ হবে। তাই নিজে তাড়াতাড়ি গ্লাসটা হাতে নিয়ে মুখে তুললুম। দেখি, টাটকা, খাঁটী, চমৎকার খেঁজুর রস।

এর মধ্যে জড়িয়েছিল একটু আগেকার ইতিহাস। কয়েকদিন আগে আমি বিশ্বভারতীর কয়েকজন অধ্যাপক এবং একদল ছাত্রের সঙ্গে মাঝরাতে গ্রামের দিকে বেড়াতে গেছলুম। পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় ঝলমল করছিল চারিদিক। আমাদের পথের পাশে দাঁড়িয়েছিল সারবন্দী খেঁজুর গাছ। মাঠের মধ্যে মাইল কয়েক গান গেয়ে, হল্লা করে, ঘোরাঘুরি করার পর ছাত্রেরা গাছ থেকে টাটকা খেঁজুর রস পেড়ে সকলকে দিলে। আমরা সেই মনোরম পানীয় খেয়ে আশ্রমে ফিরে এসেছিলুম। শান্তিনিকেতনের ছাত্র-অধ্যাপক-দের সমাজে এ কিছু নতুন অভিজ্ঞতা ছিল না, প্রতি বছর শীতকালে তাঁরা এমনি 'নিশীথ অভিযান' করে থাকেন। কিন্তু আমার জীবনে সেদিনের অভিজ্ঞতা ছিল একেবারে অভিনব। তাই পরের দিন বিকালবেলা মহাকবির কাছে কাজ করতে এসে সেই কাহিনী বেশ 'ফলাও' করে গল্প করেছিলুম। তিনি হাসতে হাসতে মন্তব্য করে-ছিলেন, অত জন একসঙ্গে ছিলে, কতটুকুই বা রস তোমার ভাগে পড়েছিল! আবার একদিন যেও।

আমার ধারণা, মহাকবি আমার খেঁজুর রসপ্রীতির কথা মনে রেখেছিলেন। তাই হয়ত এই বিশেষ দিনটিতে আমাকে খেঁজুর রস খাওয়ানোর আয়োজন করেছিলেন।

বলা বাহুল্য, এ রকম আয়োজন তিনি করেন সব সময়ে প্রগাঢ় প্রীতির অনুপ্রেরণায় নয়। অনেক সময় এর মূলে থাকে প্রধানতঃ

দাক্ষিণ্য—দরদ নয়। আর সেই দাক্ষিণ্যের উৎস হচ্ছে তাঁর সুসংস্কৃত মনের স্বাভাবিক আভিজাত্য।

এই প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনাও উল্লেখ করা যায়। আমি সকালে বিশ্বভারতীর পাঠভবন ও শিক্ষাভবনে ক্লাস নিতুম, বিকালে 'উত্তরায়ণে' গিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে সাহিত্যের কাজ করতুম। তার মধ্যে প্রধান দায়িত্ব ছিল গ্রন্থসম্পাদনা। কিছুদিন পরে বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ এই গ্রন্থসম্পাদনার কাজ ব্যাপকভাবে করার উদ্দেশে একটি নির্দিষ্ট দপ্তর সংগঠনের চেষ্টা করেন। তখন রবীন্দ্রনাথ কনফিডেন-সিয়াল রিপোর্ট লিখে নিজের মতামত প্রকাশ করেন। সেই রিপোর্টের এক অংশে ছিল আমার কাজের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা।

কয়েকদিন পরে আমি মহাকবির অনুরোধমত একখানি নৃত্য-নাট্যের সংশোধন-করা পাণ্ডুলিপি অনুলিপি করে দিই। তাতে কিছু যতি চিহ্ন অদলবদল করি এবং কয়েকটি শব্দও কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রবর্তিত নতুন বানান পদ্ধতি অনুযায়ী লিখে দিই। রবীন্দ্রনাথ অনুলিপির খাতাখানি পড়ে খুশী হন। পরের দিন বিকালে আমাকে ডেকে পাঠিয়ে জলযোগ করতে বলেন। খাওয়া শেষ হলে উঠে পড়ছি, এমন সময় তিনি বললেন, তোমার বদলানো যতি চিহ্ন আর বানানগুলো ঠিক হয়েছে। খুব ভাল লাগল যে, সাহিত্যিক হয়েও বই কপি করার কাজটা তুচ্ছ ভাবনি, বরং খুব যত্নের সঙ্গে করে দিয়েছ। তোমার সম্বন্ধে সেদিন ওদের কাছে কি রিপোর্ট দিয়েছি, তা কি দেখেছ?

রিপোর্টের কথা শুনে আমি একেবারে ত আকাশ থেকে পড়লুম। বললুম, না, কই, রিপোর্ট ত দেখিনি।

রবীন্দ্রনাথ তখনই কবি শ্রীসুধীরচন্দ্র করকে ডেকে আমাকে রিপোর্ট-এর অফিস-কপিখানি দেখাতে বললেন। তাতে লেখা ছিল ঃ "বিশ্বভারতী সম্পর্কে যে গ্রন্থসম্পাদন বিভাগ স্থাপিত হয়েছে, বলা বাহুল্য, তার মুখ্য উদ্দেশ্যই হচ্ছে আমার গ্রন্থসম্পাদন। আসন্ন

যেসব গ্রন্থ ছাপার উপযোগী তাদের প্রস্তুত করতে হবে, ভবিষ্যতে যারা ছাপাখানায় চড়বে তাদেরও তৈরি করে রাখা চাই। বিলাতে ডেণ্ট কম্পানী বড় পাবলিশর, তাঁদের প্রকাশোন্মুখ বইগুলিকে সর্বতোভাবে মুদ্রণযোগ্য করার কাজে যিনি নিযুক্ত আছেন, তাঁকে আমি বন্ধুভাবে জানি। তাঁর নাম আরনেস্ট রীস, তিনি একজন বিখ্যাত সাহিত্য রচয়িতা, সেইজন্যই তাঁর পরে এই গুরুতর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই কাজের একটা দিক আছে যেটা খুঁটিনাটির কাজ, যেমন চিহ্নসংকেত বসানো, বানানশোধন ও প্যারাগ্রাফ বিভাগ করা,—এমন কি রচনার কোন স্খলন থাকলে তার প্রতি লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ। আর একটা দিক আছে যেটাতে সাহিত্যবিচার বুদ্ধির দরকার, অর্থাৎ অসংগতি দোষ, অসংলগ্নতা, ভাষাগত ত্রুটি সম্বন্ধে প্রশ্ন দ্বারা মীমাংসা করা। শেষোক্ত কর্তব্যের প্রয়োজন অতি দৈবাৎ ঘটে। কারণ যে লেখকদের বই বেছে নেওয়া হয়, তাঁদের ভুলচুক অনবধানবশতঃই ঘটে, সহজে ঘটে না। আমার ইংরেজী 'সাধনা' ছাপাবার সময় আমি তাঁর কাজ দেখেছি। এতে যে সতর্কতা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, তা যে-সে লোকের দ্বারা সম্ভব নয়, এইজন্য এ কাজের গৌরব আছে। তাকে প্রভূত পরিশ্রম করতে হয় জানি, কিন্তু এই পরিশ্রমের দ্বারা যে যশ পাওয়া যায়, তা লেখক ও প্রকাশকের পক্ষে বহু মূল্যবান্। আমার গ্রন্থসম্পাদনার কাজে আঙ্গিক ও ভাবিক দিক থেকে এইরকম শ্রদ্ধাপূর্ণ সহায়তা পাব, এই আমার আশা ছিল এবং আছে। কাননবিহারী এই দিক থেকে চেষ্টা প্রয়োগ করছেন, দেখেছি। সে চেষ্টা কেবল কর্তব্যবোধ থেকে নয়, আমার প্রতি অনুরাগবশতঃও বটে। সেইজন্য আমার ব্যস্ততার সময়ে ক্ষণে ক্ষণে আমাকে উত্যক্ত করতে তিনি কুণ্ঠাবোধ করেন না, আমিও স্নেহের সঙ্গে ধৈর্যের সঙ্গে তা স্বীকার করে নিই। অনেক সময় তাঁকে যে নিরস্ত করে দিই, সেই তাড়নার মধ্যে তিনি আমার স্নেহ বা শ্রদ্ধার অভাব লেশমাত্র অনুভব করেন না, তাঁর সঙ্গে

আমার এই অসংকুচিত সম্বন্ধে আমি আরাম ও আনন্দ পাই, অথচ এতে তাঁর কাজের কোন শৈথিল্য ঘটতে দেখিনি।***"

মনে হয়, মানুষ রবীন্দ্রনাথের দাক্ষিণ্যের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বড় বড় আয়োজনে নয়,—সামান্য সামান্য উপকরণে। তিনি এমন ক্ষণে এমন ভাবে মানুষের মনে নাড়া দেন যে, তার অপূর্ব আবেগ অনায়াসে ভরিয়ে তোলে অনুগৃহীতের সমগ্র সত্তাকে। রবীন্দ্রনাথ হচ্ছেন দাক্ষিণ্যের জাদুকর।

॥ চার ॥

শুধু দরবারী জীবনে নয়, অন্তঃপুরের দৈনন্দিন জীবনেও রবীন্দ্রনাথ হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। অর্থাৎ পাঁচজনের একজন নন,—একেবারে পঞ্চম। স্বাতন্ত্র্যে অভিনব, মহত্ত্বে অসামান্য। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁর কাজকর্ম, চালচলন, গতিবিধি লক্ষ করলে তাঁকে শ্রদ্ধা না করে থাকা যায় না।

বড় ছোট—সকল মানুষেরই ঘরোয়া জীবনে স্বভাবতঃ থাকে স্থূলতা। আমাদের জৈব জীবনের নিত্য প্রয়োজন ত স্থূলতায় ভরা। বলা যেতে পারে, তাকে বাদ দিয়ে প্রাণ ধারণ করা অসাধ্য। তাছাড়া, সংসারে বাস করব, অথচ জীবনযাত্রার মধ্যে সাংসারিকতার লেশমাত্র থাকবে না, তাও আশা করা অসম্ভব।

রবীন্দ্রনাথ চিত্তের প্রসারতা ও একাগ্র সাধনার ফলে সেই স্থূল জীবনকে করে তুলেছেন জ্যোতির্ময়। সংসারে বেশির ভাগ মানুষেরই দিনের দিন জীবনযাপনা একটা নিছক যান্ত্রিকতা, প্রাণহীন অভ্যাসের দাসত্ব। তাতে না আছে নির্দিষ্ট কোন লক্ষ, না-বা কোন নিবিড় উদ্দেশ। অনেকক্ষেত্রেই বরং তা হচ্ছে কেন্দ্রচ্যুত। তা শুধু 'দিনগত পাপক্ষয়।'

মনে হয়, একথা কেবল সাধারণ মানুষের পক্ষেই সত্য নয়। জগতে যে সব প্রতিভাবান পুরুষেরা শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, রাজনীতি বা শিল্পসাধনার ক্ষেত্রে নাম করেছেন, তাঁদের অনেকেরই সাধারণ জীবনযাপনা এমনই লক্ষহীন। বলা যেতে পারে, এঁরা দৈনন্দিন স্থূলজীবনে নিতান্ত সাধারণ মানুষ। এঁদের অসাধারণত্ব শুধু প্রকাশ পায় নিজ নিজ সাধনার বিশেষ ক্ষেত্রে প্রতিভার দীপ্তিতে।

মানুষ রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তাঁর দিনের দিন জীবনেও আছে একটি নির্দিষ্ট পরম লক্ষ। তা যেন নিতান্ত দিনযাপনা নয়। তা হচ্ছে একটি মহাব্রতের সাধনা। আর এ সাধনায় না আছে ফাঁকি, না আছে আলস্য। তাই তা মহিমায় ভরা।

দেখেছি, শান্তিনিকেতনে তাঁর দিন কাটে নিরালায়,—পরিবারের সংস্রব থেকে দূরে। আধ্যাত্মিক সাধক যেমন গুহার মধ্যে একলা-একলা থাকেন, তিনি তেমনি ছোট বাড়িখানির মধ্যে একলা-একলা বাস করেন। মনে হয়, আত্মীয়স্বজনের সেবাশুশ্রূষা সহ্য করতে পারেন না। কোন মানুষেরই ধারাবাহিক, অবিচ্ছেদ্য অতি-ঘনিষ্ঠতা তাঁর কাছে কাম্য নয়। স্বীকার করি, পরিবারের লোকেদের ঘনিষ্ঠতার দাবি চেষ্টা করে পাওয়া জিনিস নয়। তা জন্মের সঙ্গে লাভ-করা অধিকার। তবু রবীন্দ্রনাথের কাছে এ অধিকার খুব বেশী আমল পায় না। ঠাকুরবংশের আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে ত কোনদিনই তাঁর 'মাখামাখি' ভাব দেখিনি।

অবশ্য, ছেলে, মেয়ে, বউমা—যাঁরা তাঁর একান্ত আপনজন, তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁদের উপর তাঁর স্নেহভালবাসার কোন অভাব নেই। কিন্তু যাকে বলে পারিবারিক জীবন—এক পরিবারের পরস্পরের উপর একান্ত নির্ভরশীল একত্র-বাস—তা যেন রবীন্দ্রনাথের নেই। এই নির্ভরশীলতা নেই বলেই তাঁর স্নেহ মূলতঃ কর্তব্য-অনুগামী, ব্যক্তিগত হৃদয়াবেগ-প্রধান নয়। যেখানে যেটুকু করা দরকার, সে বিষয়ে তিনি সদাই সজাগ। কিন্তু নিজেকে তিনি পরিবারের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেননি। বলা যেতে পারে, সন্তানদের প্রতি তাঁর হৃদয়ে আছে অফুরান পিতৃস্নেহ, নেই মানুষ রবীন্দ্রনাথের নিবিড় ভালবাসা।

মহর্ষির শেষ বয়সের সন্তান রবীন্দ্রনাথ। জন্মের সঙ্গে পেয়েছেন একটা সহজ নিরাসক্তি। তাই হয়ত সংসারে কোন আকর্ষণের মধ্যেই মাতামাতি করা তাঁর সহ্য হয় না। কি বাইরের জীবন, কি ঘরের জীবন—সর্বত্রই তাঁর কাজকর্মের ভিতরে দেখা যায় একটা প্রচ্ছন্ন নির্লিপ্ততা। তাঁর ভালবাসায় আবেগের আকর্ষণ আছে, নেই মায়ার ডোর।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মহাকবির প্রতিদিনটি বাঁধা থাকে নানা কাজের মালায়। তাঁর প্রতি ঘণ্টা কাটে কঠোর পরিশ্রমে।

তিনি বিছানা থেকে খুব ভোরবেলা ওঠেন। আগে আরও সকালে নাকি উঠতেন। শুনেছি, রোজ কিছুক্ষণ ভোরের আকাশে সূর্যোদয়ের দিকে মুখ করে বসে থাকেন। সংসারের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করার আগে তাঁর 'মনের মানুষ'এর কাছে নিবেদন করেন নিজেকে।

তারপর শুরু হয় কাজের স্রোত। বই পড়া, নিজের হাতে চিঠি লেখা, ছাপা রচনার প্রুফ দেখা, কবিতা বা প্রবন্ধ লেখা, ছবি আঁকা, শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতনের কর্মীদের প্রয়োজনমত উপদেশ বা নির্দেশ দেওয়া অথবা আশ্রমের অতিথিদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ, আলাপআলোচনা করা। আমি যখন আশ্রমে ছিলুম, তখন তিনি বিশ্বভারতী পরিচালনার কাজ আর বিশেষ দেখতেন না। তাছাড়া, পারিবারিক জমিদারি দেখাশোনার সংস্রব ত অনেক দিন আগেই ত্যাগ করেছিলেন। তবু সকালে দুপুরে বিকালে সন্ধ্যাবেলা—যখনই তাঁর কাছে গেছি, দেখতে পেয়েছি, তিনি কোন না কোন কাজের মধ্যে ব্যাপৃত আছেন।

বয়স তাঁর হল সাতাত্তরের কাছাকাছি। তবু বার্ধক্যের আলস্য তাঁর দেহমনকে অধিকার করতে পারেনি। দুপুরে খাবার পর কিছুক্ষণ আরাম চৌকিতে বসে খবরের কাগজ পড়েন। সে সময়ে ইদানিং হয়ত কদাচিৎ কখন কখন ঢুল আসে। কিন্তু দিবানিদ্রা বা নিয়মিত দুপুরে বিশ্রাম করার অভ্যাস তাঁর নেই।

শুনেছি, এমনই ভাবে তাঁর পরিণত জীবনের বেশির ভাগ কেটেছে। তিনি বিলাসী সমাজে, বিত্তবান্ বংশে জন্মগ্রহণ করে-ছিলেন। এদেশে প্রয়োজনের তাগিদেই লোক পরিশ্রম করে—এ অপবাদ অনেক দিনের। গরম দেশ, পল্লীপ্রধান সমাজ। অল্পে তুষ্ট মন। সমুদ্রের পলীমাটি-জমা, স্যাঁতসেঁতে ভূমিতে বাস। তার উপর উর্বরা জমি থেকে অল্পায়াসে-পাওয়া অজস্র ফসল। এই অবস্থা সমাবেশে প্রাচীন বাঙলায় মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের

অভাব ছিল না। তার ফলে বাঙালী জাতির স্বভাবের মধ্যে কুঁড়েমি যেন কায়েমী হয়ে গিয়েছিল। আজও আমরা পূর্বপুরুষদের সেই বনেদী শ্রমবিমুখতা একেবারে ছাড়তে পারিনি। এদিক থেকে রবীন্দ্রনাথকে মোটেই বাঙালীর বংশধর বলা যায় না। তাঁর প্রকৃতির মধ্যে আছে কাজের নেশা। মনে হয়, জীবনসাধনার অন্যতম লক্ষ হিসাবেও তিনি গ্রহণ করেছেন কর্মযোগ। তাই কাজ ছাড়া তিনি থাকতে পারেন না। নিষ্কর্মা, উদ্দেশহীন, অকারণ শূন্য দিন তাঁর দীর্ঘ জীবনে একান্ত বিরল। সাধারণতঃ, অটুট আলস্যের আরাম উপভোগ করা তাঁর পক্ষে দারুন বিরক্তিকর।

রবীন্দ্রনাথ এক কাজ ফুরলে নতুন কাজ সৃষ্টি করে নেন। আমি যখন তাঁর কাছে যাই, সে সময়ে কিছুদিন থেকে তিনি যেন কোন মৌলিক রচনার আবেগ তেমন অনুভব করছিলেন না। তাই "বিশ্ব পরিচয়", "বাংলাকাব্য পরিচয়" প্রভৃতি কয়েকখানি বই-এর সম্পাদনার কাজ শুরু করেন। এমন কি শুধু গতানুগতিক, সাধারণ কাজ নিয়ে বেশী দিন তাঁর মন সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। বড় কাজের তন্ময়তা তাঁর চাই। সৃষ্টির নেশায় মেতে না উঠতে পারলে তাঁর তৃপ্তি থাকে না। একখানা চিঠিতে আছে, "দীর্ঘকাল না করেছি কোন কাজের মত কাজ, বা পড়ার মত পড়া। সেই-জন্যই ভিতরে ভিতরে মনটা আত্ম-অসন্তোষের ভারে অত্যন্ত পীড়িত হয়ে আছে।" এ রকম আত্ম-অসন্তোষের দুঃসহ পীড়ন বারবার তাঁর জীবনে ঘটে। তারপরেই আসে নতুন কোন সৃষ্টি-প্রেরণা। কিছু-দিন আবার চলে গভীর সাধনা।

সৃষ্টির নেশা যখন জাগে, তখন তাতে তিনি মনপ্রাণ দিয়ে মেতে ওঠেন। তাঁর চারিদিকের পৃথিবীকে আর মনে থাকে না। তিনি যেন অন্য লোকে চলে যান। "বিশ্বপরিচয়" রচনার সময় দেখেছি তাঁর এমনই তন্ময়তা।

সব চেয়ে আশ্চর্য এই যে, এই তন্ময়তার কালেও তাঁর প্রাত্যহিক

বাঁধা-বরাদ্দ কাজগুলো বন্ধ থাকত না। তিনি লোকেদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎও করতেন, জরুরী চিঠিপত্রের জবাবও লিখতেন, বিশ্বভারতীর প্রয়োজনীয় কাজের সম্বন্ধে উপদেশও দিতেন। অবশ্য তাঁর চোখের দিকে চাইলে বোঝা যেত যে, সব কাজ চালিয়ে দিচ্ছেন বটে কিন্তু মন তাঁর এ রাজ্যে নেই।

লেখার কাজে মনসংযোগ করা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আছে অসামান্য শক্তি। বোধ হয়, ১৯৩৭ সালের কথা। ঠিক হল, সেবার বর্ষামঙ্গলের উৎসব হবে পুরোতন গান দিয়েই। দিনের পর দিন গানের মহড়া চলতে লাগল। আর কয়েক দিন মাত্র উৎসবের বাকি। এমন সময় হঠাৎ রবীন্দ্রনাথের খেয়াল হল, নতুন গান রচনা করতে হবে। ভাবতে ভাবতে এসেও গেল সৃষ্টির নেশা।

একদিন সকালে তাঁকে একখানি ইংরেজী কাব্য-সংকলনের বই দেবার জন্য 'উত্তরায়ণে' গেছি। তিনি বইখানা আগে থেকে চেয়ে রেখেছিলেন। হঠাৎ 'উদয়নে'র দক্ষিণ দিকের বারান্দার লাগোয়া ঘর থেকে মহাকবির কণ্ঠস্বর শুনতে পেলুম। তিনি যেন কোন কবিতার চরণ বারবার সুর করে আবৃত্তি করছেন। পাশের ঘর দিয়ে মহাকবির কাছে যাবার পথ ঘরের দরজায় উপস্থিত হতেই বনমালী সামনে এসে দাঁড়াল, মৃদু হাসতে হাসতে সবিনয়ে বললে, এখন গুরুদেব যে বর্ষামোংগলের গান নিকৃচেন। নোকজনের সঙ্গে দেখা করচেন না। তবে আপনি যান। আপনার যেতে বারণ নেই।

বনমালীর সবিনয় ইংগিত বুঝলুম। ও হয়ত সকলকেই এই কথা বলে ভদ্রভাবে নিষেধ জানাচ্ছে। আমি ভিতরে ঢুকলুম না। তার হাত দিয়ে বইখানা রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়ে দিলুম। শুনতে পেলুম, মহাকবি তখন গাইছেন, 'এস শ্যামল সুন্দর—'।

বনমালী ভিতরে গিয়ে বইখানা দিলে। মহাকবি জিজ্ঞাসা করলেন, কে দিয়েছে? কানন? ডাক্ তাকে। আর বইখানা এইখানে রেখে দে।

আমি একান্ত সংকোচ ভরে তাঁর কাছে গিয়ে প্রণাম করলুম। তিনি আমাকে সেদিনকার বিকালের কাজ সম্বন্ধে কয়েকটি নির্দেশ দিলেন। তাঁর কথা শেষ হলে আমি তাড়াতাড়ি বিদায় নিলুম।

তারপর ?

বাইরে আসতেই শুনতে পেলুম, তিনি আবার শুরু করেছেন, "এস শ্যামল সুন্দর— ।"

রচনার সময় বাধা পাওয়ার জন্য বিরক্তি প্রকাশ নেই। সুর কেটে যাবার অভিযোগ নেই। মনসংযোগের অপূর্ব শক্তি বলে তিনি নিমেষেই মনোনিবেশ করলেন সাহিত্য-সৃষ্টির কাজে।

বলা বাহুল্য, সেবারের বর্ষামঙ্গলের প্রায় সব কটি গানই হল নতুন। শুনেছি, অনেক সময় নতুন কবিতা যখন আসে, এমনি-ভাবেই আসে। নিজের অন্তর্লোকের সঙ্গে চলে তাঁর নিত্য লীলা-খেলা। তারই ফাঁকে কোন সুযোগে হঠাৎ দু-চারটি চমৎকার চরণ মহাকবির মনে গুনগুনিয়ে ওঠে। তিনি তখন ছোট ছোট নোট বুকের পাতায় তা লিখে ফেলেন। তারপর চলে সেই চরণগুলির বারবার পুনর্আবৃত্তি। সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হয় নতুন নতুন চরণ।

সব জাতের সৃষ্টিরই মূলে থাকে বেদনা। এ প্রকৃতির চিরন্তন বিধান। মানুষ রবীন্দ্রনাথের জীবনেও বারবার দেখা গেছে, আত্ম-অসন্তোষের পরেই এসেছে সৃষ্টির প্রেরণা। যখন অনেক দিন ধরে সেই অকারণ অসন্তোষ ভোগ করেও নেশা জাগে না, তখন মহাকবির মনের বেদনা হয় দুঃসহ। তিনি কিছুতেই শান্তি পান না। তাঁর বাইরের ভাবভঙ্গী দেখে স্পষ্ট বোঝা যায়, কি যে করবেন, তা স্থির করে উঠতে পারছেন না। তিনি মনের এই অশান্ত অবস্থায় কখন বাড়ি বদলান, কখন দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। তাঁর হৃদয় চির-নূতনের উপাসক। তাঁর চাই নব নব পরিবেশ, নব নব পরিচয়। তাঁর অন্তরে আছেন একজন পরম-উদাসী। তাই অনেক দিন ধরে একই কাজে, একই স্থানে, একই গোষ্ঠীর সংস্রবে থাকা তাঁর পক্ষে

দুঃসাধ্য। বাসা ভাঙার—বাঁধন ছেঁড়ার নেশা রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির মধ্যে। মনের পথ দিয়ে যখন "সুদূর"এর ডাক এসে পৌঁছয় না, তখন বাইরের পথে চলে তার আগমনীর আবাহন।

মহাকবি এই রকম ভ্রমণের শেষে প্রায়ই অভিনব উৎসাহে কাজে লাগেন। পরিচিত স্থানে ফিরে আসেন নতুন মন নিয়ে। তাই সেখানে আর পুরাতন পরিচয়ের মালিন্য অনুভব করেন না। তখন তাজা উদ্যমে আরম্ভ করেন হয় কোন জনহিতকর কাজ, না-হয় কাব্যরচনা, না-হয়ত ছবি আঁকা।

*

* *

কাজের মানুষ রবীন্দ্রনাথের আর একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। দৈনন্দিন জীবনে তিনি কাজ দিয়ে কাজের ক্লান্তি দূর করেন। তাঁর বিশ্রামের ধারণা আমাদের মত নয়। তাঁর কাছে ক্লান্তি বিনোদনের সেরা উপায় হচ্ছে, ভিন্ন জাতের কাজে নিজেকে নিয়োগ করা।

কর্মবিরতিতে নেই অবসাদের শেষ। হয়ত তাঁর ধারণা, একঘেয়েমি বোধকে নাশ করতে পারাই হচ্ছে যথার্থ অবসাদের অবসান। তাই তিনি অনে‥ সময় সারাদিনের বাঁধা কাজের মালার পরও কাজ শুরু করেন, সন্ধ্যাবেলায় বসান নাচগান অভিনয় শেখানোর বৈঠক। দিনের অপরাপর তথাকথিত দরকারী কাজের মত একাজেও থাকে তাঁর সমান একাগ্রতা। মনে হয়, অবিশ্রাম কর্মযোগে তাঁর পরম উল্লাস।

হয়ত, এই কাজের নেশা পাশ্চাত্য প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য,—প্রাচ্যের নয়। ভারতবাসী বুড়ো বয়সে কাজ ছেড়ে সাধারণতঃ আধ্যাত্মিক চিন্তায় মন দেয়। কর্মব্যস্ততার চেয়ে কর্মত্যাগের শান্তিই তাঁর চরম কাম্য। জীবনে পরম যত্নে যেটুকু সিদ্ধি পেয়েছেন, তার তৃপ্তিই হবে জীবনসায়াহ্নের শেষ সম্বল। স্বীকার করি, রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি এ ধরনের নয়। তাঁর রক্তে আছে যেন চির-অতৃপ্তি। এক সিদ্ধি

থেকে আর এক সিদ্ধিলাভই তাঁর হৃদয়ের চরম কামনা। দেখেছি, সাতাত্তর বছর বয়সেও তাঁর সৃষ্টির আশা মেটেনি। জীবনে তিনি যা পেয়েছেন, তুলনা তার নেই। পৃথিবীর যে কোন তিনচারজন মহাপুরুষের সিদ্ধি একত্র করলেও রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধির সমান হবে কিনা সন্দেহ। তবু তাঁর চাওয়ার শেষ নেই। আজও তিনি মহাজীবনের কাছ থেকে নব নব জয়ের মালা কামনা করেন।

কোন কোন রবীন্দ্রভক্ত মহাকবির এই বৈশিষ্ট্যকে ভাল চোখে দেখতে পারেন না। তাঁদের ধারণা, শেষ বয়সে এই অনির্বাণ কামনার বহ্নি তাঁর মত মহাবৈরাগীর যোগ্য নয়। সংসারে সব আরম্ভেরই সমাপ্তি আছে। যত বড় গুণী হোন, আর যত বড় প্রতিভাবানই হোন, জীবনে কামনার ইতি না হলে কোন মানুষেরই মুক্তি নেই।

মনে হয়, রবীন্দ্র-চরিত্রের বিচারে সব সময়ে প্রচলিত কষ্টি-পাথর ব্যবহার করলে চলবে না। তাঁকে ঠিক ঠিক বুঝতে হলে তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দিয়ে বিচার করতে হবে। জীবন এবং মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁর আছে অভিনব ধারণা। মানুষের মরণকে তিনি জীবনের সমাপ্তি বলে বিশ্বাস করেন না। মৃত্যু তাঁর কাছে হচ্ছে এক নব জীবনের সূচনা। মানুষের জীবন অন্তহীন। তাঁর দৃঢ় ধারণা এই যে, বার বার জন্মমরণের মধ্য দিয়েই মানব-আত্মার অফুরান জয়যাত্রা। কোথাও তার ইতি নেই। "ফাল্গুনী" নাটকে সেই অপরূপ বাণীই রূপায়িত হয়ে উঠেছে।

মরণের প্রতীক্ষায় শেষ-জীবনে সব কর্মসাধনা থেকে বিদায় নিয়ে বিজনে বিরলে বন্ধনমোচনের যে চেষ্টা—রবীন্দ্রনাথ হয়ত তার মধ্যে চরম সার্থকতা দেখতে পান না। অন্তরে তিনি চির-তরুণ। সারা জীবন বন্ধনের ভিতরে থেকেই বন্ধন-মোচনের সাধনা করেছেন। তাই তাঁর শেষ বয়সের নব নব সিদ্ধিলাভের চেষ্টার মধ্যে নেই অস্বাভাবিক বাসনার বহ্নি। তার মধ্যে বরং আছে ইহ-

জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কর্মযোগের বা শিল্পযোগের দ্বারা আত্ম-উপলব্ধির অনির্বাণ তপস্যা।

*

* *

রোজকার জীবনে রবীন্দ্রনাথের আর একটি গুণ সহজেই চোখে পড়ে। তা হচ্ছে তাঁর অপরিসীম সৌজন্য-বোধ। সকলকে তিনি আপন ভাবেন, তা নয়। সৌজন্যবোধ আত্মীয়তা নয়। সৌজন্যের মূলে প্রেম থাকে না, থাকে সংস্কৃত মনের উদারতা। অতি নীচ-মনা মানুষও আপনজনদের সঙ্গে আন্তরিকভাবে আত্মীয়তা করতে সক্ষম। কিন্তু তার কাছে সৌজন্য আশা করা অনেক সময়ে দুরাশা মাত্র।

রবীন্দ্রনাথকে কখন সৌজন্য প্রকাশে কার্পণ্য করতে দেখিনি। মানুষ মাত্রেরই উপর তাঁর হৃদয়ে আছে একটি স্বাভাবিক মর্যাদা বোধ। মনে হয়, সাম্য বোধ থেকে এর উৎপত্তি নয়। তাঁর কাছে সকল মানুষ হচ্ছে সমান,—একথা বললে ভুল বলা হবে।

বরং একথা বলাই সমীচীন যে, তাঁর মনের স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে গুণীর দিকে, ধনীর দিকে নয়। নিছক ধনের জন্য যাঁদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা, তেমন ঘরেব কোন জানাশোনা লোক তাঁর কাছে এলে তিনি তাঁকে করেন আদর। কিন্তু গুণীমাত্রকেই করেন সমাদর।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর অতিথির স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয়ে খুঁটিনাটি সবকিছু নিজে তত্ত্বাবধান করতে ভালবাসেন। এ কাজের ভার তাঁকে সচরাচর অপরের উপরই দিতে হয়। তবু অপরের উপর দিয়ে তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পারেন না। অতিথি যত সামান্যই লোক হোন না কেন, তাঁর পরিচর্যার ত্রুটি ঘটলে তিনি খুব ক্ষুণ্ন হয়ে পড়েন।

নিত্য কত রকমের লোক তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হয়। তাদের কত অদ্ভুত বায়না, কত অন্যায় উপদ্রব। রবীন্দ্রনাথ হয়ত কখন কখন বিরক্ত হন। কিন্তু কোনদিন সে বিরক্তি সামনাসামনি প্রকাশ করেন না। উদার মনে অতিথির ত্রুটি সহ্য করেন।

বিশ্বভারতীর কলকাতা গ্রন্থন-বিভাগের একজন অফিসার মাঝে মাঝে কাজের সূত্রে শান্তিনিকেতনে যান। সে কাজের সঙ্গে মহাকবি ব্যক্তিগতভাবে জড়িত। বারবার দেখেছি, রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর থাকাখাওয়ার ব্যবস্থা করছেন।

তিনি নিশ্চয়ই জানেন, বিশ্বভারতীর যাঁরা কর্মী, তাঁদের শান্তিনিকেতনে থাকাখাওয়ার কোন অসুবিধা হবার সম্ভাবনা নেই। তবু ভদ্রলোক যে তাঁর নিজের অতিথি হয়ে এসেছেন। পাছে অতিথি-সৎকারে কোন ত্রুটি হয়, তাই সব সময়ে মহাকবি সন্ত্রস্ত থাকতেন।

কারো কারো মুখে তাঁর অসৌজন্যের অভিযোগও শুনেছি। তাঁরা বলেন, মহাকবির খেয়ালী মন। সবকিছুই নির্ভর করে খেয়ালের উপর। তিনি একদিন কত আদর যত্ন করেন, আর একদিন আবার একেবারে চিনতেই পারেন না!

মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের যে ব্যবহার নিছক সৌজন্যনিষ্ঠা ছাড়া আর কিছু নয়, তাকে হয়ত এঁরা ভুল করে মনে করেন ঘনিষ্ঠতা। তাই একদিনের আদরযত্নে মুগ্ধ হয়ে আর একদিন যখন ঘনিষ্ঠতা দাবী করে বসেন, তখনই আঘাত পেয়ে ফিরে আসতে হয়।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা আলোচনা করা যেতে পারে। মহাকবির মনে অতিথি-পরিচর্যার সঙ্গে অতি অদ্ভুতভাবে জড়িয়ে আছে ঠাকুর পরিবারের মর্যাদাবোধ।

একবার কলকাতার একজন সাহিত্যিক সপরিবারে তাঁর অতিথি হন। সঙ্গে ছিল শিশু। ছোটদের কখন্ কি চাই,

তা না পেলে কষ্ট হতে পারে—এই ভেবে রবীন্দ্রনাথ অতিথিদের থাকবার জন্য তাঁর নিজের 'পুনশ্চ' বাড়িটি ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন।

তা দেখে তাঁর পার্শ্বচরেরা একটু কুণ্ঠিত হলেন। এ ব্যবস্থা যে একমাত্র বিশ্ববিখ্যাত অতিথিদের জন্যই করা হয়ে থাকে!

তাঁরা মহাকবিকে জানালেন, 'পুনশ্চ' নয়, আমরা বরং সাধারণ অতিথিশালায় সবচেয়ে ভাল ঘরে এঁদের থাকার আয়োজন করি।

মহাকবি ক্ষুণ্ণ হয়ে উত্তর দিয়েছিলেন, সে কি। যে সাহিত্যিক, সে আবার বড়লোক, গরিবলোক কি! ঠাকুরবংশে অতিথির আদর-আপ্যায়ন কোনদিন সামাজিক মর্যাদার মাপকাঠিতে করা হয়নি।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য সাহিত্যিক অতিথি সপরিবারে 'পুনশ্চে'ই এসে উঠলেন।

*

* *

মানুষ রবীন্দ্রনাথ তারুণ্য-ধর্মী। মন তাঁর প্রাণপ্রবাহের নিত্য-চাঞ্চল্যে লীলাময়।

দেখেছি, জীবনের প্রান্তসীমায় এসেও তাঁর আচারে ব্যবহারে রুচিতে কোথাও জরার চিহ্ন জাগেনি। বিচারে আসেনি নতুনের প্রতি অশ্রদ্ধা। গতানুগতিককে চিরস্থায়ী বলে গ্রহণ করা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ।

শান্তিনিকেতনে আজও বাস করছেন একজন প্রাচীন, প্রাক্তন কর্মী। নাম অধ্যাপক হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।[১] তাঁর মুখে একটি পুরাতন গল্প শুনেছি।

১ কয়েকবছর আগে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেছেন।

মহর্ষির আদেশে রবীন্দ্রনাথ তখন সবেমাত্র জমিদারি পরিচালনার ভার নিয়েছেন। কিছুদিন কাজ করবার পর তাঁর চোখে পড়ল, বুড়ো বুড়ো গোমস্তা-কর্মচারীরা প্রজাদের অকারণ পীড়ন করে, অসাধু উপায়ে করে অতিরিক্ত আয়।

তিনি এ ব্যাপারে চুপ করে থাকতে পারলেন না। কয়েকজন বিশ্বাসী উপরওয়ালা কর্মচারীর সঙ্গে পরামর্শ করলেন।

তাঁরা জানালেন, এ শুধু ঠাকুর স্টেটে নয়, বাংলাদেশের সর্বত্র জমিদারির কাজে অনেক দিন থেকে এ ব্যাপার ঘটে আসছে। এ রদ করা খুবই মুশকিল। কেননা, জমিদারী সেরেস্তার কাজে অভিজ্ঞ, বুদ্ধিমান অথচ সাধু কর্মচারী এদেশে পাওয়া প্রায় অসম্ভব।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, আমি একাজে ইংরেজী-জানা, কমবয়সী, নতুন লোক নিয়ে আসব।

ঠাকুরবাড়ির কর্তৃপক্ষ তাঁর প্রস্তাব অনুমোদন করলেন না। সন্দেহ প্রকাশ করে বললেন, ও সব লোক দিয়ে কি জমিদারির কাজ চলে?

রবীন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন, চেষ্টা করে একবার দেখি না।

বলা বাহুল্য, এই সংস্কার কাজের উদ্যোগ পর্বে নানা বাধা জাগল। তবু তিনি পিছিয়ে গেলেন না। নিজের সংকল্প ছাড়লেন না। কম-বয়সী, ইংরেজী-জানা নতুন নতুন কর্মচারী নিয়োগ করলেন। তাঁদের মনে জাগিয়ে তুললেন, প্রজাসেবার অনুপ্রেরণা। পণ্ডিত হরিচরণ তরুণ বয়সে ছিলেন এমনি একজন কর্মী।

পরে এই নতুন ব্যবস্থায় বেশ সুফল ফলেছিল। হরিচরণবাবু বলেন, সেকালে ইংরেজ রাজকর্মচারীরা অনেকেই ঠাকুর স্টেটের সুপরিচালনার সুখ্যাতি করে গেছেন।

সাধারণতঃ, নতুনকে ভয় পাওয়াই প্রবীণের পক্ষে স্বাভাবিক। প্রবীণ জীবনের পথ অনেকখানি অতিক্রম করে এসেছেন, তাঁর

অভিজ্ঞতার ভার ক্রমশঃ গুরু হয়ে উঠেছে। তিনি জানেন, সংসারে অনেক আশা সফল হয় না, অনেক উদ্যম অঙ্কুরেই নষ্ট হয়ে যায়। তাই তাঁর স্বাভাবিক চেষ্টা হচ্ছে, পদে পদে হিসাব করে চলা।

কিন্তু এই সাধারণ নিয়মে মানুষ রবীন্দ্রনাথকে বাঁধা যায় না। "বাংলাকাব্য পরিচয়" সম্পাদনার সময় বারবার তাঁর এই পরিচয় পেয়েছি।

আগে একটু ইতিহাস বলে নিই। কয়েক মাস হল শান্তি-নিকেতনের কাজে যোগ দিয়েছি। একদিন হঠাৎ বিকাল বেলা রবীন্দ্রনাথ ডেকে পাঠালেন।

আমি তাঁর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলুম। তিনি বিশেষ ভূমিকা না করে বলতে শুরু করলেন, তোমাকে একটা কথা কয়েক দিন ধরে বলব বলব মনে করছিলাম। দেখ, তুমি ত এখানে পারিশ্রমিক যা পাচ্ছ, তা বিশেষ কিছু নয়। আমি তোমাদের উপযুক্ত টাকা দিতে পারি না। সে ফাণ্ড আমার নেই। অবশ্য শহরে থাকার চেয়ে এখানে থাকার খরচ কম। তবু, তুমি এখন ছেলেমানুষ, পরে তোমার খরচ বাড়বে, অভাবও বাড়বে। তাই বলছিলাম, তুমি কিছু কিছু পাঠ্যপুস্তক লেখার চেষ্টা করো। আমি দেখে দেব। হয়ত বিশ্বভারতীকে দিয়ে তা প্রকাশ করার ব্যবস্থাও হতে পারবে। আমাদের দেশে ভাল পাঠ্যপুস্তকের অভাব। এ কাজ করা লোকে যত সহজ মনে করে, তত সহজ নয়।

তাঁর কথা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলুম। আশ্রিতের প্রতি মহাপুরুষের একি বদান্যতা!

সকৃতজ্ঞভাবে উত্তর দিলুম, আমার অনেক দিনের ইচ্ছে "গোলডেন ট্রেজারী অব মডার্ন লিরিক্স"-এর মত বাংলাভাষায় একখানি কবিতা-সংকলন প্রকাশ করা। তাতে থাকবে সেরা কবিদের বাছাই-করা কবিতা আর সেই কবিতাগুলি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত

টীকা ও টিপ্পনী। তা পড়ে পাঠকদের মনে যেন সেরা কাব্যরস সম্বন্ধে একটি নিবিড় ধারণা জন্মায়।

তিনি খুশী হলেন। বললেন, বছর খানেক আগে অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি একখানি বাংলা কাব্যসংকলন প্রকাশ করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা প্রশান্তকে[১] ভার দিয়েছিলেন। আমাকেও তাঁরা এর মধ্যে আটকে রেখেছেন। একখানা খসড়া তৈরী হয়েছিল। কিন্তু কি জানি প্রশান্ত শেষ পর্যন্ত কি করলে!

তারপর একটু থেমে কথা শেষ করলেন, দেখি, কলকাতায় যাচ্ছি ত। খোঁজ করব।

বোধ হয়, সপ্তাহ দুয়েক পরের কথা। তিনি কলকাতা থেকে ফিরে এলেন।

আমি ইতিমধ্যে তাঁর "গল্পগুচ্ছ"গুলির সম্পাদনার ভার পেয়েছিলুম। সেই সূত্রে দেখা হতেই তিনি বললেন, তোমার কাব্যসংকলনের কথা ভেবেছি। সাধারণের জন্য ওরকম বই ত প্রশান্তরাই করছেন। তুমি বরং আর এক কাজ করো। আমরা শীঘ্র লোক-শিক্ষাসংসদের কাজ শুরু করব। লোকে যাতে বাড়িতে পড়াশোনা করে বাংলা ভাষায় পরীক্ষা দিয়ে উপাধি পায়, তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সেই পরীক্ষার জন্য উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক চাই। তুমি ইনটারমিডিয়েট স্ট্যানডার্ড-এর ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী এমনি একখানি "বাংলাকাব্য পরিচয়" সংকলনের কাজ আরম্ভ করে দাও। গোড়া থেকে শুরু করে সত্যেন দত্তের সমসাময়িক কবিদের কাল পর্যন্ত রচনা বাছবে। প্রেমের কবিতা যতদূর সম্ভব বাদ দেবে। "গল্পগুচ্ছ" সম্পাদনার সঙ্গে সঙ্গে একাজও করো।

তারপর রবীন্দ্রনাথ কয়েকমাস বেশ নিষ্ঠার সঙ্গে কবিতা-সংকলনের কাজ করলেন। তাঁর বিচারে প্রাক্-রবীন্দ্র যুগের অনেক জনপ্রিয় কবিতা নিতান্ত বাজে বলে বিবেচিত হল।

১ অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ।

তিনি বললেন, এ ত সত্যিকার লিরিক নয়, এ যে শুধু ছন্দে বক্তৃতা।

শেষে অনেক খোঁজাখুঁজি করে এই সব কবিদের লেখা অল্প-পরিচিত অথচ রসোত্তীর্ণ কয়েকটি কবিতা নির্বাচন করলেন।

ক্রমে রবীন্দ্রোত্তর যুগের শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র এবং শ্রীবুদ্ধদেব বসুর রচনাও নির্বাচিত হল।

রবীন্দ্রনাথ এইখানে সংগ্রহের কাজ শেষ করে এবার টীকা টিপ্পনী লেখার পালা শুরু করবেন—ভাবছেন, এমন সময় হঠাৎ সব পরিকল্পনা গেল বদলে।

তাঁর কলকাতায় কয়েকদিন থাকার সময় কারা যেন দেখা করতে এসেছিলেন। তাঁরা তরুণ কবিদের উৎসাহ দেবার উদ্দেশে মহাকবির কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের মনে সে কথা লেগেছিল। তিনি উৎসাহ ভরে আধুনিক কবিদের কতকগুলি রচনা 'সংকলনে'র পাণ্ডুলিপিতে যোগ করে দিতে লাগলেন।

কিন্তু আধুনিক কবিদের সেরা রচনা সবই প্রায় ভালবাসার কবিতা। ফলে পাঠ্যপুস্তকের আদি পরিকল্পনায় যে পাণ্ডুলিপি তৈরি করা হয়েছিল, তাতে কিছুকিছু ভালবাসার কবিতা আশ্রয় পেলে।

রবীন্দ্রনাথের হঠাৎ-জাগা এই উৎসাহ দেখে বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ ভয় পেলেন। তাঁরা নানাভাবে তাঁকে আধুনিক কবিদের লেখা বাদ দেবার অনুরোধ জানাতে লাগলেন।

কিন্তু তিনি সে সব যুক্তিতর্ক কানে তুললেন না, বারবারই একথা বললেন, বয়সে কাঁচা বলেই তাঁদের লেখা বাদ দেব কেন? লিরিক রচনা সম্বন্ধে তোমাদের অনেক নামজাদা পুরোতন কবির কোন ধারণাই ছিল না। লিরিক সম্বন্ধে আধুনিক কবিদের ধারণা এবং রসবোধ অনেক বেশী।

মনে পড়ছে, অমি নিজে কয়েকজন কবি সম্বন্ধে অভিযোগ জানিয়েছিলুম। বলেছিলুম, এঁরা ত শুধু বয়সে কাঁচা নন, লেখাতেও কাঁচা যে! এঁদের কবিতা কেন যোগ করছেন?

তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, তেমন পাকা লেখা নয় বটে, তবু লেখার মধ্যে একটা নতুন চেষ্টা ত রয়েছে। এই নতুন চেষ্টাকে অশ্রদ্ধা করি কেমন করে বলত?

অনেক সময় তরুণ কবিদের লেখা সম্বন্ধে মহাকবির বিচার পুরোপুরিভাবে মেনে নিতে পারিনি।

মনে হয়েছে, বৃদ্ধ পিতামহ স্নেহে অন্ধ, অযথা তরুণ উত্তরাধিকারীদের প্রশ্রয় দিচ্ছেন।

শুধু আজ নয়। তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে এরকম অনেকবার ঘটেছে। নূতনের অজুহাতে অনেক অযোগ্য লোক তাঁর কাছে অযথা উৎসাহ লাভ করেছেন।

তবু বলি, রবীন্দ্রনাথের অন্তরে আছে নূতনের প্রতি একটি সহজ সশ্রদ্ধ অনুরাগ। তাকে শ্রদ্ধা না করে থাকা যায় না।

তারুণ্যের একটি বিশেষ গুণ হচ্ছে জরার প্রতি বিতৃষ্ণা। চিরতরুণ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দেখেছি জরার প্রতি সেই বিরূপতা। তা মনের জরাই হোক, বা দেহের জরাই হোক।

তিনি বয়সে বুড়ো হয়েছেন। তাঁর উপরকার দেহাংশ কোমর থেকে অল্প ঝুঁকে পড়েছে। তার ফলে চলতে গেলে দেহে থাকে না আগেকার দৃঢ়তা। পা টলতে থাকে। তাই ঝুঁকে পড়ে খুব তাড়াতাড়ি হাঁটেন।

তবু হাঁটবার সময় কেউ তাঁকে সাহায্যের চেষ্টা করলে তিনি বিরক্ত হন।

দেখেছি, অসুখের পর অতিথির মুখে কুশল প্রশ্ন তাঁর ভাল লাগত না।

এই সময়ে একজন পুরাতন ভক্ত একদিন তাঁর বন্ধুকে নিয়ে

মহাকবিকে দেখতে আসেন। বন্ধুটি পরিচয়ের প্রথম পর্ব শেষ হতেই আবেগভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, এখন কেমন আছেন ?

স্পষ্ট দেখতে পেলুম, প্রশ্ন শুনে মহাকবির মুখে বিরক্তির রেখা ফুটে উঠল।

কিন্তু নব-আগন্তুক ভদ্রলোক তা লক্ষ করলেন না। তাই উত্তর না পেয়ে একটু পরে আবার প্রশ্নের পুনর্-উক্তি করলেন।

যে ভক্ত তাঁকে সঙ্গে করে এনেছিলেন, তিনি আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। ব্যাপারটা সামলে নেবার উদ্দেশে চকিতে বলে উঠলেন, জানি গুরুদেব, আপনি অসুখকে অসুখ বলে মানেন না। কিন্তু এত বড় অসুখের পর 'কেমন আছেন' জিজ্ঞাসা না করলে যে আমাদের তৃপ্তি হয় না!

মহাকবির মুখ থেকে নিমেষে বিরক্তির রেখা হল লুপ্ত। তিনি উত্তর দিলেন, তা যদি জান ত আবার জিজ্ঞাসা করো কেন ? কবে আমি খারাপ থাকি যে ভাল আছি কিনা—জিজ্ঞাসা করছ ?

পদের গরিমা অনেক সময় আমাদের দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করে। তখন নিজেদের দোষ সহজে চোখে পড়ে না। আমরা ভাবি, আমরা সকল বিচারের বাইরে। ভুলে যাই, যেই করুক, অন্যায় সব সময়ে অন্যায়। পদমর্যাদার অজুহাতে অন্যায়ের গুরুত্বকে লঘু করা যায় না। বড়র যেমন আছে ছোটর অন্যায় বিচার করে দেখার স্বাভাবিক দায়িত্ব, তেমনি ছোটরও আছে বড়র অন্যায়ে মতপ্রকাশের অধিকার।

আমার দৃঢ় ধারণা, মানুষ রবীন্দ্রনাথ তাঁর শ্রেষ্ঠ মুহূর্তে মিথ্যা কৌলিন্যকে আদৌ আমল দেন না। মনে পড়ে, শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের এক লঙ্কাকাণ্ডের কথা।

একদিন কলকাতার একজন নৃত্যশিল্পী শান্তিনিকেতনে আসেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, রবীন্দ্রনাথকে তাঁর শিল্পদক্ষতা দেখাবেন।

মহাকবি স্বাভাবিক ঔদার্যবশে অনুরোধ করামাত্র রাজী

হলেন। সিংহসদনে শিল্পীর নাচের আয়োজন করা হল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সন্ধ্যাবেলা নাচ দেখতে আসতে পারলেন না। হঠাৎ তাঁর শরীর খারাপ হল।

আশ্রমের অধ্যাপক আর ছাত্রছাত্রীরা নাচের আসরে যোগ দিলেন। কিন্তু নাচ দেখে তাঁরা অনেকেই খুশী হতে পারলেন না। শিল্পীর কসরতে বাঈজীদের ঢঙে অধঃঅঙ্গের সঞ্চালন অস্বাভাবিকভাবে প্রকট হয়ে উঠছিল। তা দর্শকদের কাছে অত্যন্ত হাস্যকর বোধ হওয়ায় সভায় কিছু কিছু গোলমাল এবং হৈ-চৈ হয়।

পরের দিন হঠাৎ প্রতিষ্ঠাতাচার্যের ঘরে আশ্রমবাসী অধ্যাপকদের ডাক পড়ল। প্রথমটা আমরা ত অবাক হয়ে গেলুম। পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলুম, ব্যাপার কি ?

তারপর যথা সময়ে মহাকবির কাছে হাজির হয়ে দেখি, এক বিচার সভার আয়োজন হয়েছে। একদিকে কলেজের কতকগুলি উগ্র স্বভাবের ছাত্র বাদী আর একদিকে আসামী হচ্ছেন অধ্যাপকের দল।

রবীন্দ্রনাথ গম্ভীরভাবে বললেন, ছাত্রেরা অভিযোগ জানিয়েছেন, কাল নাকি তোমরা নাচের সময় গোলমাল করছিলে! তাই ওদেরও ডেকেছি, তোমাদেরও ডেকেছি। সকলের সামনেই মামলার বিচার হবে।

আর একটি চমৎকার গল্প শুনেছি। তখনও শান্তিনিকেতনে উপনগর গড়ে ওঠেনি। কয়েকজন কর্মী ও ছাত্রকে নিয়ে আশ্রম চলছে। একটি সামান্য ঘরে দপ্তর বসে।

মহাকবি নিজেই দপ্তরের বেশির ভাগ খুঁটিনাটি কাজ দেখাশোনা করেন। এমন কি ধোপার হিসাবও তাঁকে রাখতে হয়। দপ্তরে থাকেন একজন মাত্র চাকর। তিনিই একসঙ্গে জমাদার, দরওয়ান ও বেয়ারা। জাতিতে নাকি তিনি নাপিত। তাই ঝাড়ু হাতে করে

ঘর পরিষ্কার করার কাজ করতে তাঁর কৌলিন্যে বাধে। এ নিয়ে তিনি মনে মনে খুব ক্ষুণ্ণ। তবু মুখ ফুটে কিছু না বলে কাজ চালিয়ে দেন।

হঠাৎ একদিন তাঁর উগ্র মর্যাদাবোধ বিদ্রোহ করে উঠল। তিনি দপ্তরের কেরানী অধ্যাপকদের জানালেন, ঘর ঝাঁট দিতে আর পারব না।

তখন আশ্রমে চাকর বেশী ছিল না। কাজেই কর্মীরা মুশকিলে পড়লেন। এ কাজ ত আর তাঁরা নিজেরা করতে পারেন না!

যথা সময়ে রবীন্দ্রনাথ দপ্তরের ঘরে এসে উপস্থিত হলেন,—অন্যদিনের মত। প্রথমেই তাঁর চোখে পড়ল ঘরের চারদিকে ময়লা রয়েছে। জিজ্ঞাসা করলেন, আজ কি অফিস-ঘর পরিষ্কার করা হয়নি?

—আজ্ঞে না। একজন কর্মী সব কথা খুলে বললেন।

মহাকবি এক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে কোণ থেকে ঝাড়ুটা তুলে নিয়ে ঘর পরিষ্কার করতে লেগে গেলেন।

—একি! গুরুদেব, কি করছেন?

নিমেষে চারিদিকে হৈ-চৈ পড়ে গেল।

'কুলীন' নাপিত লজ্জা পেয়ে দৌড়ে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে এলেন দপ্তরের অপরাপর কর্মীরা।

তাঁরা সকলে মিথ্যা মর্যাদার লজ্জা ত্যাগ করে আশ্রম-প্রতিষ্ঠাতার হাত থেকে ঝাড়ু কেড়ে নিলেন।

বলা বাহুল্য, এ রবীন্দ্রনাথের সমাজতান্ত্রিক চিন্তার ফল নয়। এ হচ্ছে মানুষের প্রতি মানুষের সহজ মর্যাদাবোধ। সমাজে যাঁরা প্রজা বা যাঁরা শুধু হাতের কাজ করেন,—মানুষ হিসাবে একটি সাধারণ মর্যাদা তাঁদের প্রাপ্য। সে মর্যাদা দিতে না পারা মানে মনুষ্যত্বের অপমান করা। বোধ হয়, এই হচ্ছে মহাকবির ধারণা।

আর একটা গল্প বলি। ১৯৩৭ সালের কথা। সেবার বোলপুরে বীরভূম জেলা রাষ্ট্রিক সম্মেলনের অধিবেশন হল। সেই উপলক্ষে প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে কৃষক সমাবেশ হয়। তাতে অপ্রত্যাশিতভাবে দূরদূরান্তের গ্রাম থেকে বহু কৃষাণকারিগর এসে যোগদান করেন।

সভায় কলকাতার বিখ্যাত কয়েকজন সমাজতন্ত্রী নেতা গরম গরম ভাষণ দেন। তাঁদের সঙ্গে কংগ্রেসসেবক বক্তাদের তুমুল তর্ক বিতর্ক হয়।

রবীন্দ্রনাথের কানে সব খবর গেছল। পরের দিন সকালে একদল কৃষাণ মহাকবিকে প্রণাম করার উদ্দেশে 'উত্তরায়ণে' এসে হাজির হলেন।

তিনি তাঁদের কাছে বসে অনেকক্ষণ তাঁদের কথা শুনলেন। শেষে আবেগ ভরে জিজ্ঞাসা করলেন, দেখ, নেতাদের কথা ত অনেক শুনেছি। ও সব রাখ। এখন সাদা কথায় বলো, তোমরা কি চাও, তোমরা নিজেরা কি ভাব। তোমাদের মুখে তোমাদের কথা শুনতে চাই। তোমরা নিজেরা যা বলবে, তা-ই আমি মেনে নেব।

তথাকথিত সাম্যবাদী নেতারাও যে গণ্ডি অতিক্রম করতে কুণ্ঠিত হন, মহাকবি সেদিন তা অনায়াসে পার হয়ে গেছলেন।

বারবার দেখেছি, কোন ইজ্‌ম্‌-এর আওতায় তিনি মনের মধ্যে জড়তা জমতে দেন না। মানুষ হিসাবে এইটাই তাঁর সহজরূপ। আবার এইটাই তাঁর বিশেষ গুণ।

॥ পাঁচ ॥

শান্তিনিকেতনে ব্যক্তিগত জীবন ছাড়াও মানুষ রবীন্দ্রনাথের আছে একটি দরবারী জীবন। তিনি যে সেখানকার আশ্রমগুরু, তিনি যে সংঘের পরিচালক। তাঁর অফিসিয়াল পদবী হচ্ছে 'প্রতিষ্ঠাতাচার্য'।

মূলতঃ এ তাঁর কর্মযোগীর রূপ।

বলা বাহুল্য, জনসেবামূলক কর্মে অনুরাগ রবীন্দ্রপ্রকৃতির একটি মৌলিক প্রেরণা। এ তাঁর কবিহৃদয়ের ভাববিলাস নয়। প্রকৃতি-সঙ্গ ছাড়া যেমন তাঁর জীবনে সুখ নেই, জনসেবামূলক কর্মানুষ্ঠান ছেড়ে তেমনি তিনি স্বস্তি পান না। নিঃস্বার্থ কর্মযোগ তাঁর সমগ্র জীবনসাধনার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

কিন্তু যোগী হওয়া এক, সংগঠনে দক্ষ হওয়া আর এক। সংসারে এক সত্তার মধ্যে দুয়ের মিলন ঘটে কদাচ।

মনে হয়, মহাকবির কাজ করার পদ্ধতি ঠিক শ্রেষ্ঠ কর্মীর মত নয়। এদিক থেকে তিনি যেন খাঁটি 'ভারতীয়'।

দেখেছি, ইংরেজরা সংঘের কার্যধারাকে এমন নিয়মের শৃঙ্খলে বেঁধে ফেলেন যে, কাজ করতে গিয়ে কোন একজন লোকবিশেষের মুখাপেক্ষী হয়ে বসে থাকতে হয় না। তাই আয়োজনের ক্ষেত্রে যে কোন সময়ে একের সামনে আর একজনকে বসিয়ে দিলে সাধারণতঃ নির্বিঘ্নে কাজ চলে যায়। একাধিক সহকর্মীর মধ্যে কাকে কি কাজ করতে হবে, তার সুনির্দিষ্ট সীমা থাকে। একজনকে আর একজনের কর্তব্য সম্বন্ধে মাথা ঘামাতে হয় না। তাঁরা যান্ত্রিক ধারায় নিজের নিজের কাজ করে যান। সমগ্রের ভাবনা ভাবেন পরিচালক।

সবচেয়ে লক্ষণীয় এই যে, ইংরেজরা কাজে হাত দেবার অনেক

আগে থেকেই তৈরি করেন কাজের একটি পরিকল্পনা। সেই পরিকল্পনার মূলে থাকে অনেক বিচার, অনেক ভাবনা।

মনে হয়, ভারতীয় সংগঠকদের মন সহ্য করতে পারে না এত হিসাব, এত বাঁধাবাঁধি। তাঁদের ধারণা, কাজে হাত দেবার আগে এত রীতি আর নীতি নির্ধারণ যেন নিতান্ত অকাজ। তাঁদের কাজ করার পদ্ধতির মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় একটা অগোছালো, আলুথালু ভাব। তাই আমাদের গড়া সংঘে প্রায়ই পরিচালকের সাময়িক খেয়ালের উপর নির্ভর করে কর্মীদের চলতে হয়। যন্ত্রের ধারায় সুনির্দিষ্ট পথে আপন আপন কর্তব্য করা কঠিন হয়ে পড়ে।

অবশ্য কাজে নিছক যান্ত্রিকতা কোন সময়েই কাম্য নয়। কিন্তু যেখানে দশজনকে নিয়ে কারবার, সেখানে যন্ত্রের শৃঙ্খলা যে সুষ্ঠুভাবে কার্যনির্বাহের পক্ষে খুবই দরকারী। শৃঙ্খলার শৃঙ্খল না থাকলে শিথিল হয়ে পড়ে কর্মীদের পরস্পরের যোগের বাঁধন। তাতে গোষ্ঠীশক্তি হয় অকারণে বিঘ্নিত। সংঘজীবনে জাগে না সুসংহতির প্রেরণা।

শান্তিনিকেতনে বাস করলে এই ধারণা জন্মায় যে, রবীন্দ্রনাথ যত বড় কবি, তত বড় সংগঠক নন। বিশ্বভারতীর পরিচালনার মূলে যেন নেই কোন নির্দিষ্ট কাজের ধারার পরিকল্পনা।

সবচেয়ে বড় কথা, বিশ্বভারতীর কর্মপ্রণালীর মধ্যে নেই প্রয়োজনমত দৃঢ়তা।

জানি, রবীন্দ্রনাথ নিজে এই দৃঢ়তার পক্ষপাতী নন। একখানি বিখ্যাত চিঠিতে তিনি স্পষ্ট করেই একথা স্বীকার করেছেন। বলেছেন, "শুধু আমি নই, শান্তিনিকেতনে অনেকেই আপন আপন সাধ্যমত একটি সুসংগতির মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করবার সুযোগ পেয়েছেন। এটা যে হয়েছে, সে কেবল আমার জন্যই হয়েছে—একথা যদি বলি তাহলে অহংকারের মত শুনতে হবে কিন্তু মিথ্যে বলা হবে না। আমি নিজের ইচ্ছার দ্বারা বা

কর্মপ্রণালীর দ্বারা কাউকে অত্যন্ত আঁট করে বাঁধিনে। তাতে কোন অসুবিধা হয় না তা বলিনে—আমি নিজেই তার জন্য অনেক দুঃখ পেয়েছি। কিন্তু তবু আমি মোটের :উপর এইটে নিয়ে গৌরব করি। অধিকাংশ কর্মবীরই এর মধ্যে ডিসিপ্লিনের শিথিলতা দেখে অর্থাৎ না-এর দিক থেকে, হাঁ-এর দিক থেকে দেখে না। স্বাধীনতা ও কর্মের সামঞ্জস্য সংঘটিত এই যে ব্যবস্থা এটি আমার একটি সৃষ্টি। আমার নিজের স্বভাব থেকে এর উদ্ভব। আমি যখন বিদায় নেব, যখন থাকবে সংসদ, পরিষদ ও নিয়মাবলী, তখন এ জিনিসটিও থাকবে না। অনেক প্রতিবাদ ও অভিযোগের সঙ্গে লড়াই করে এতদিন একে বাঁচিয়ে রেখেছি। কিন্তু যারা বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ তারা একে বিশ্বাস করে না। এর পরে স্কুল মাস্টারের ঝাঁক নিয়ে তারা অতি বিশুদ্ধ জ্যামিতিক নিয়মে চাক বাঁধবে। শান্তিনিকেতনের আকাশ ও প্রান্তর ও শালবীথিকা বিমর্ষ হয়ে তাই দেখবে ও দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলবে। তখন তাদের নালিশ কি কোন কবির কাছে পৌঁছবে?”[১]

একথা মানি, তত্ত্বের দিক থেকে এই কর্মপ্রণালী শ্রেষ্ঠ এবং শ্রদ্ধেয়। কিন্তু সংসারীরা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ নিয়েই বিচার করবেন।

সেদিক থেকে সবিনয়ে বলব, বিশ্বভারতীর ইতিহাসে এই কর্মপদ্ধতির সুফল তেমন ফলেনি। বরং অনেক কর্মীই ‘স্বাধীনতা’র সুযোগ নিয়েছেন, নেননি ‘স্বাধীনতা’র দায়িত্ব।

যে পরিবেশের মধ্যে ‘আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে’—ব্যবস্থা সফল হতে পারত, কর্মীদের দুরদৃষ্টক্রমে তেমন পরিবেশ হয়ত কখন শান্তিনিকেতনে গড়ে ওঠেনি। ফলে সৃষ্টি হয়েছে বিশৃঙ্খলা। দেখা গেছে, মহাকবি বারবার নতুন নতুন কর্মীর উপর বিশেষ বিশেষ কাজের দায়িত্ব একান্তভাবে

১ “পথে ও পথের প্রান্তে”।

ছেড়ে দিয়েছেন। কখন-বা সে ভার যোগ্যের হাতে পড়েছে। কিন্তু মহাকবির আদর্শধারার সঙ্গে মেলেনি তাঁর আদর্শধারা, তাই মাঝপথে ঘটেছে বিচ্ছেদ। কখন-বা অযোগ্যের হাতে দায়িত্ব পড়ায় প্রতিষ্ঠানের কাজ গেছে পিছিয়ে।

মহাকবির চিত্তে আছে অযোগ্যকে সহ্য করবার অদ্ভুত শক্তি। হয়ত তিনি এত বড় যে অযোগ্যকে অবজ্ঞা করতে তাঁর মন পীড়িত হয়ে ওঠে।

এই দরদ জীবনের ক্ষেত্রে পরম উদারতা সন্দেহ নেই। কিন্তু কর্মানুষ্ঠানের সংকীর্ণ ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ বিপজ্জনক। তা পরিচালকের মনে আনে দুর্বলতা, কাজকে করে পণ্ড।

হয়ত এই দরদের ফলে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী হয়ে উঠেছে একটি "নোয়ার নৌকা"[১]। বিচিত্র মানুষ তাতে আশ্রয় পেয়েছেন। তাতে বাঙালী আছেন, গুজরাটী আছেন। মারাঠী-ভাষী আছেন, হিন্দীভাষী আছেন। ইংরেজ আছেন, ফরাসী আছেন। চৈনিক আছেন, জাপানী আছেন। সিংহলী আছেন, জাভাবাসী আছেন। বিচিত্র তাঁদের আদর্শ, বিচিত্র মনের গড়ন। কেউ ব্রাহ্মণ, কেউ ব্রহ্মবাদী। কেউ বৌদ্ধ, কেউ খ্রীষ্টান। কেউ বাউল, কেউ বাস্তববাদী। কেউ রামাইত, কেউ বৈষ্ণব। কেউ জ্ঞানযোগী, কেউ কর্মযোগী। কেউ আধুনিক ইনটেলেকচ্যুয়াল, কেউ প্রাচীনপন্থী অপরচ্যুনিস্ট। কেউ কংগ্রেসী, কেউ মার্ক্সবাদী। অবশ্য, তাঁরা সকলেই রবীন্দ্রভক্ত। কিন্তু তাঁদের মধ্যে মনে প্রাণে যথার্থ বিশ্বভারতীর সেবক আছেন যে কয়জন, তাঁদের সম্ভবতঃ সংখ্যা হবে চলিত কথায় যাকে বলে 'লাখে এক'।

আবার এও বলি। বিশ্বভারতীর সেবক হওয়া কি সহজ কথা? সত্যিকার বিশ্বভারতী কোথায় যে তার সেবক পাওয়া যাবে? হাসপাতালের বাড়ি তৈরী হলেই কি 'সেবাসদন' প্রতিষ্ঠিত হয়?

১ "দি হোলি বাইবেল"।

গ্রন্থকার

মনে হয়, শান্তিনিকেতনে *সবই* আছে। আছে *সিংহসদন* আর *বিদ্যাভবন*। আছে আকাশ, মাঠ আর শালবীথি। আছে সংসদ আর তার নিয়মাবলী। আর আছেন পরম প্রতিভাবান রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু সেখানে ঠিক ঠিক বিশ্বভারতী আছে কিনা সন্দেহ।

ওখানকার যাঁরা শ্রদ্ধেয় প্রবীণ কর্মী, তাঁদের অনেকের সঙ্গে আলোচনা করে দেখেছি। জিজ্ঞাসা করেছি, বিশ্বভারতীর বিশেষ রূপটি কি? বাস্তব ক্ষেত্রে তার কর্মধারার বিশেষত্ব কোথায়? তাঁরা উত্তর দিয়েছেন বটে। কিন্তু তাঁদের মধ্যে আছে নানা মুনির নানা মত। কর্মজীবনে ওঁরা সবাই সন্ধান করছেন। কিন্তু কিসের সন্ধান করছেন, সে ধারণাটা নিতান্ত অস্পষ্ট।

মনে হয়, ঠিক ঠিক বিশ্বভারতী আজও লুকিয়ে আছে রবীন্দ্রনাথের মনে। সেখানে তিনি যে অভিনব বিপ্লবকর তত্ত্বধারাকে পরম বিস্ময়কর অনুভূতিরূপে লাভ করেছেন, বাইরে প্রাণবন্ত শক্তিরূপে প্রত্যক্ষ কর্মানুষ্ঠানের মধ্যে তা এখনও রূপায়িত করতে পারেন নি। এর কারণ অনেকগুলি। প্রথমতঃ, বিদেশী সরকারের অর্থ সাহায্য তিনি গ্রহণ করতে চাননি। অথচ বেসরকারী সাহায্য প্রয়োজনমত মেলেনি। রবীন্দ্রনাথ হতে পারেননি ডঃ মদনমোহন মালব্য। দেশী ধনীসমাজের কাছে তাঁর ভিক্ষার আবেদন ঠিকমত পৌঁছয়নি। অনেকের ধারণা, তাঁর আভিজাত্য বোধই এ বিষয়ে হচ্ছে চরম বাধা। কিন্তু আমার মনে হয়, তাঁর স্পর্শচেতন (Sensitive) শিল্পী-প্রকৃতি তাঁকে ভিক্ষার কাজে এগিয়ে আসতে দেয়নি। তিনি দিতে পারেন,—অকুণ্ঠিত মনে সারাজীবন দিয়েও এসেছেন। কিন্তু নিতে জানেন না। সব চাওয়ার মধ্যেই কোথায় যেন লুকিয়ে থাকে একটা হীনতা।

দ্বিতীয়তঃ, তিনি পাননি মনের মত শিষ্য, যিনি একসঙ্গে সংগঠনে দক্ষ অথচ কর্মযোগী। জীবনে তিনি বসওয়েল পেয়েছেন, পাননি মহাদেব দেশাইকে। স্বামী বিবেকানন্দের শ্রীরামকৃষ্ণমিশন কি

সফল হত যদি সারদানন্দ না থাকতেন ? রবীন্দ্রনাথ "পথে ও পথের প্রান্তে"র একখানি চিঠিতে নিজেই স্বীকার করেছেন, "বুঝতে পারি, কাছের লোকের মধ্যে আমার প্রাণের অনুপ্রারণ ঠিকমত ঘটে ওঠেনি। আমার পিতৃদেব যেমন করে আপনার জীবনের দীক্ষাকে রেখে গেছেন, আমি আমার অন্তরের ধ্যানটিকে তেমন করে রেখে যেতে পারব না। তার জায়গায় ব্যবস্থা আসবে, কর্মের চাকা চলবে। একটা কারণ, আমার মনঃপ্রকৃতির বিচিত্রতা। আমি সব দিকেই যাই, সব কথাই বলি, সব ছবিই আঁকি।"

*

* *

অনেক সময় বলা শেষ হলেও বক্তব্যের শেষ হয় না। শেষের পরেও থাকে শেষ কথা। যেমন চিঠিতে 'ইতি'র পরে থাকে 'পুনশ্চ'। প্রবন্ধের বই-এতে শেষ অধ্যায়ের পর পরিশিষ্ট।

কর্মযোগী রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে তেমনি আর একটি কথা বলা দরকার। তা না বললে আমাদের আলোচনা হবে অসম্পূর্ণ।

শান্তিনিকেতনে মহাকবির ধ্যানলব্ধ শিক্ষাসত্র আজও সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি সত্য। তবু নানা অভাব, নানা বাধার ভিতর দিয়ে তিনি যেটুকু করেছেন, তার তুলনা নেই। এ যেন ঢাল নেই, তরোয়াল নেই,—তা সত্ত্বেও তিনি হয়ে উঠেছেন বিশ্বশিক্ষা-ক্ষেত্রে নিধিরাম সর্দার।

এ কথা কে না স্বীকার করবে যে, শান্তিনিকেতন আশ্রমে কবিচিত্তের স্বপ্নেভরা যে কল্পলোক গড়ে উঠেছে, তার মধ্যে ক্ষুদ্র আকারে অপরূপভাবে রূপ পেয়েছে অনাগত কালের সংস্কৃতিময় ভারতবর্ষ। এই সৃষ্টি যেমন অপূর্ব, তেমনি বিস্ময়কর। বলা বাহুল্য, এর স্রষ্টা একা রবীন্দ্রনাথ। অপরে তাঁর বাহন মাত্র। তিনি ইঞ্জিনিয়ার, অপরে শুধু মিস্ত্রিমজুর। এ অভিনব তাজমহলের শাহ্জহান হচ্ছেন মহাকবি।

আধুনিক ভারতের এই তপোবন দেখতে শান্তিনিকেতনে এসেছেন দেশবিদেশ থেকে অতিথির দল। তাঁরা অনেকেই মহা মহা মনীষী। গান্ধী[১], সুভাষ[২], নেহেরু[৩], এসেছেন। শরৎচন্দ্র[৪], রাধাকৃষ্ণন[৫], সুনীতিকুমার[৬]। এসেছেন এন্‌ড্রুস[৭], পিয়ারসন[৮], এলম্‌হারস্‌ট[৯]। অধ্যাপক ফরমিকি[১০], নোগুচি[১১], জুপেঁয়[১২]। এসেছেন অধ্যাপক কিলপ্যাট্রিক[১৩], উইল ডুরাণ্ট[১৪], রামসে

১ মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। ২ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু।

৩ পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু। ৪ কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৫ ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন। ৬ ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

৭ দীনবন্ধু সি, এফ, এন্‌ড্রুস।

৮ উইলিয়ম উইন্‌স্টন পিয়ারসন। এই বিপ্লবী ইংরেজ তরুণ ছিলেন ইংলণ্ডের খানদানী পরিবারের সন্তান। লণ্ডন মিশনারী কলেজের উদ্ভিদবিজ্ঞানের অধ্যাপকরূপে ভারতবর্ষে প্রথম আসেন। পরে শান্তিনিকেতনে যোগদান করেন। কিছুদিন মহাকবির সেক্রেটারী ছিলেন।

৯ এল, কে, এলম্‌হার্‌সট। তরুণ বয়সে এই ইংরেজ কৃষিবিজ্ঞানবিদ্ শ্রীনকেতনের কাজে যোগদান করেন। তিনি বহুবৎসর বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার টাকা করে শ্রীনিকেতনে দান করেছেন। চীন ও আমেরিকা ভ্রমণে মহাকবির সেক্রেটারী ছিলেন।

১০ অধ্যাপক কারলো ফরমিকি, রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতভাষার অধ্যাপক।

১১ য়োনে নোগুচি। বিখ্যাত জাপানী কবি।

১২ জুপেঁয় (Ju Peon)। বিখ্যাত চৈনিক শিল্পী।

১৩ অধ্যাপক উইলিয়াম এচ, কিলপ্যাট্রিক। তিনি আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাতত্ত্বের বিখ্যাত অধ্যাপক। জন ডিউই বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাতত্ত্ববিদ্। কিলপ্যাট্রিক তাঁর শিষ্য।

১৪ বিখ্যাত আমেরিকান লেখক। তিনি ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে একখানি বই লেখেন "The Case for India"। তার উৎসর্গ পত্রে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লিখেছেন, "You alone are sufficient reason why India should be free."

ম্যাকডোনাল্ড[১৫]। ডঃ টিমবার্স[১৬], অধ্যাপক টাকার[১৭], সিলভ্যাঁ লেভি[১৮]। অধ্যাপক বেনোয়া[১৯], উইন্টারনিট্জ[২০], ডঃ বাকে[২১]। ডঃ লেসনি[২২], অধ্যাপক বগদানফ[২৩]—আরও কত কে! তাঁরা এসেছেন, দেখেছেন, মুগ্ধ হয়ে ফিরে গেছেন। তাঁদের প্রশংসার ফলে দেশে দেশে জগজ্জনের মনে পরম শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নূতন ভারতবর্ষ।

ইংরেজ য়েট্স ব্রাউন বিখ্যাত "বেঙ্গল ল্যানসার" বই-এর লেখক। তিনি দুবার শান্তিনিকেতনে আসেন। একবার ১৯৩৬ সালে আর একবার প্রায় পনের বছর আগে। তিনি একটি প্রবন্ধে লিখেছেন, "Santiniketan still seems to me one of the most spiritually stimulating places in the world, looking beyond our day to a world-harmony, which will come through beauty, born in many forms and

১৫ গ্রেট ব্রিটেনের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী।

১৬ ডঃ হ্যারি টিমবার্স পূর্ব আমেরিকার কোয়েকার সম্প্রদায়ভুক্ত চিকিৎসক। কিছুদিন শ্রীনিকেতনের চিকিৎসা বিভাগে কাজ করেন।

১৭ অধ্যাপক বি, জি, টাকার। আমেরিকান মিশনারী, কিছুদিন বিশ্বভারতীতে কাজ করেন।

১৮ প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ বিখ্যাত ফরাসী অধ্যাপক। বিশ্বভারতীর প্রথম ভিসিটিং প্রফেসর।

১৯ সুইস-ফরাসী অধ্যাপক ফারডিনাণ্ড বেনোয়া (Benoit)।

২০ ডঃ এম উইন্টারনিট্জ, প্রাগের জারমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ববিখ্যাত সংস্কৃত-অধ্যাপক।

২১ ডঃ এ বাকে (Bake), জাতিতে ডাচ। ভারতীয় সংগীত সম্বন্ধে গবেষণা করতে শান্তিনিকেতনে আসেন।

২২ ডঃ ভি লেসনি (Lesny), প্রাগের চেক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত-অধ্যাপক।

২৩ পারসিভাষার মহাপণ্ডিত, জাতিতে রাশিয়ান।

many lands, in the soil and soul of nationhood. Tagore has been described by his enemies as a poseur, and his university as a place where students spend their time in the blissful beautitude of communicating with the incommunicable. That is easy to say. Santiniketan does not always show results that can be measured by the world's coarse thumb and finger; but it is exactly as a protest against such material standards of success that its founder will be remembered by posterity, not only in India, but throughout the world. He is ahead of the ruck and run of us. *** Tagore remains in my mind as a beautiful but somewhat tragic figure……behind Santiniketan there is not yet the driving force of a great popular movement, but only a great man; a man who makes the arc of the sky see bigger after one has met him."[১]

আর একজন বিশিষ্ট অতিথির কথা বলি। তাঁর নাম স্যর জন রাসসেল। তিনি যখন শান্তিনিকেতনে আসেন, তখন আমি শান্তিনিকেতনে কাজ করছি। স্যর জন রাসসেল ছিলেন কৃষি-রসায়নশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত। জাতিতে ইংরেজ। জগৎজোড়া তাঁর নাম।

মনে পড়ে সেদিন সকালের কথা। তখন আম্রকুঞ্জের কাছে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ক্লাস করছিলুম। স্যর জন আশ্রম পরিদর্শন করতে করতে হাজির হলেন সেখানে। দেখতে পেলুম, চোখে মুখে তাঁর অপূর্ব বিস্ময়ভরা আনন্দের দীপ্তি। মনে হল, তিনি ভারতের বড় বড় শহর এবং সরকারী কৃষিশালা ঘুরে এসে হঠাৎ যেন কেমন একটা অপ্রত্যাশিত রাজ্যে পৌঁছে গেছেন! তাই আশ্রমে যা কিছু দেখছেন, তাতেই মুগ্ধ না হয়ে থাকতে পারছেন না।

তিনি খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রসন্ন মনে আমাদের

১ "বিশ্বভারতী নিউজ", নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯৩৬।

পড়ানোর কাজ দেখলেন। তারপর এগিয়ে এসে উৎসাহভরে শেকহ্যাণ্ড করে আমাকে বললেন, মুক্ত আকাশের নীচেয় বসে পড়াতে না জানি আপনার কতই ভাল লাগছে! আমি আপনার ক্লাসের একটা ফটো নিতে পারি কি ?

—নিশ্চয়ই! এ ত আমার সৌভাগ্যের কথা।

সেদিন রাত্রে তিনি বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। তারপর শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন সম্বন্ধে তাঁর নিবিড় শ্রদ্ধার কথা শুনতে পেলুম। তিনি লিখে গেছলেন, "It is rare to find so much of the university ideal realized within so small a compass."

॥ ছয় ॥

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের রূপটি নিয়ে অনায়াসে বিশ্লেষণ করা চলে, বিচার করা চলে। কিন্তু চলে না সিদ্ধান্ত করা। সে কাজে আছে ভুল করার সহজ সম্ভাবনা।

একদল রবীন্দ্রভক্ত এমনি একটি ভয়ংকর ভুল করেন। তাঁরা বলেন, মহাকবির কাছাকাছি গেলে মনে হয়, তাঁর জীবনে সর্বদা যেন একটা অভিনয়ের ভাব প্রকট। তিনি সহজভাবে মানুষের কাছে নিজেকে ধরা দিতে চান না।

মনে হয়, এ ধারণা পুরোপুরি ঠিক নয়। বরং বলা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথ সহজভাবে নিজেকে ধরা দিতে চান না—নয়, তিনি সহজভাবে নিজেকে ধরা দিতে পারেন না।

অবশ্য স্বীকার করি, মহাকবির ব্যক্তিসত্তার চারিদিকে ঘিরে আছে রহস্যময় এক দুর্ভেদ্য আবরণ। তাই হয়ত তিনি অতি-কাছের মানুষের পক্ষেও সব সময়ে যেন মূলতঃ 'দূরের মানুষ'। কিন্তু এই ব্যবধান-রক্ষাকে ভুল বুঝে কৃত্রিম অভিনয় মনে করলে চলবে না। এটা তাঁর পাঁচজনের মধ্যে নিজেকে পঞ্চম বলে জাহির করার ইচ্ছাকৃত চেষ্টা নয়। ভিতরটা যাঁর শূন্যকুম্ভ, তিনিই সমাজের কাছে নিজের বিশিষ্টতা বজায় রাখবার জন্য ব্যস্ত হন। যাঁর নিজের ব্যক্তিত্ব নেই, জনতার স্রোতে নিজেকে হারিয়ে ফেলবার ভয় হয় তাঁরই। তাই তাঁকে অতি-যত্নে নিজের গুরুত্ব প্রমাণ করার উদ্দেশে পদে পদে অভিনয় করতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই সে ধরনের মানুষ নন। তিনি যে সাধারণ মানুষের কাছে সাধারণ হয়ে নেমে আসতে পারেন না—এই দুর্বলতা তাঁর সহজাত। এর মধ্যে লেশমাত্র কৃত্রিম চেষ্টা নেই।

যাঁরা "জীবনস্মৃতি" পড়েছেন, তাঁরা জানেন, ঠাকুরবাড়ির চাকর

শ্যাম ছেলে বয়সে রবীন্দ্রনাথকে একটা জানালার ধারে বসিয়ে চারিদিকে খড়ির গণ্ডি এঁকে দিত।[১] তারপর ভয় দেখিয়ে বলত, খবরদার, এই গণ্ডির বাইরে যাবে না। গেলেই বিষম বিপদ হবে। অবোধ শিশু ভয়ে ভয়ে চুপ করে বসে থাকতেন। গণ্ডির পরিধি পার হয়ে সঙ্গীদের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারতেন না। মনে হয়, কালের প্রভাবে আজ সেই বাইরের বাধা দূর হয়ে গেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মনোজগতে এখনও সেই দুরতিক্রমণীয় গণ্ডি বিরাজ করছে। মানুষের একান্ত নিকটে মানুষ হিসাবে আজও তিনি সব সময়ে এসে পৌঁছতে পারেন কিনা, সন্দেহ।

অদ্ভুত জটিল এই মহামানুষটির চরিত্র। বাস্তবজীবনে তিনি যেন "রক্তকরবী"র রাজা। আপন ইচ্ছায় চারিদিকের আবরণ ভেদ করে বাইরে আসতে পারেন না, যেখানে সাধারণ মানুষ সহজ আনন্দে মাতামাতি করছে। তাঁকে দেখে মাঝে মাঝে ভয় হয়, সাধারণ জীবনের আনন্দ বলে তাঁর মধ্যে বুঝি আর কিছু নেই। যেখানে তিনি সামান্য লোক নন,—শিল্পগুরু, সেই জীবনের গুরুভার বর্ম বুঝি তাঁর স্বাভাবিক চর্মের সঙ্গে এমনভাবে এঁটে গেছে যে, তা তিনি ইচ্ছে করলেও আর খুলে ফেলতে পারেন না।

শান্তিনিকেতনে লক্ষ করেছি, আপাতদৃষ্টিতে তাঁর সামাজিকতার কোথাও ত্রুটি নেই। আশ্রমবাসী ছোট বড় তরুণ—সকলের

১ "আমাদের এক চাকর ছিল, তাহার নাম শ্যাম। শ্যামবর্ণ দোহারা বালক, মাথায় লম্বা চুল, খুলনা জেলায় তাহার বাড়ি। সে আমাকে ঘরের একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসাইয়া আমার চারিদিকে খড়ি দিয়া গণ্ডি কাটিয়া দিত। গম্ভীর মুখ করিয়া তর্জনী তুলিয়া বলিয়া যাইত, গণ্ডির বাহিরে গেলেই বিষম বিপদ। বিপদটা আধিভৌতিক, কি আধিদৈবিক, তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝিতাম না। কিন্তু মনে বড় একটা আশঙ্কা হইত। গণ্ডি পার হইয়া সীতার কি সর্বনাশ হইয়াছিল, তাহা রামায়ণে পড়িয়াছিলাম। এইজন্য গণ্ডিটাকে নিতান্ত অবিশ্বাসীর মত উড়াইয়া দিতে পারিতাম না।"

সঙ্গেই মেলামেশা করছেন। কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষ করলে বুঝতে পারা যায়, তাঁর কণ্ঠে নেই "ডাকঘরে"র ঠাকুরদার মত সহজ সুর। অঙ্গে নেই অসংকোচ, সাবলীল গতিছন্দ। তিনি যেন আশ্রমের সবার প্রিয়, অথচ কারোর আপন নন।

মহাকবি আপনাতে আপনি ভরপুর, একান্ত নিঃসঙ্গ, একাকী। হয়ত পৃথিবীতে সত্যিকার সকল মহামানুষেরাই তা-ই। তাঁদের শিষ্যেরও অভাব হয় না, শত্রুরও অভাব হয় না, অভাব হয় অন্তরঙ্গ বন্ধুর।

সংসারে রবীন্দ্রনাথের সমান-সমান বন্ধু কেউ নেই। হয়ত আজ পর্যন্ত তাঁর অন্তরঙ্গ শিষ্য হবার পরম সৌভাগ্যও কারো হয় নি। অসামান্য তাঁর নিঃসঙ্গতা। ব্যক্তিগত জীবনে কোন মানুষেরই উপর তিনি একান্ত নির্ভরশীল হতে চান না। মনে হয়, কারো কাছে শিষ্য হিসাবে তিনি নিজেকে সঁপে দিতে পারেন নি। হয়ত পারেন নি কারো হাতে অন্তরঙ্গ বা প্রেমিক হিসাবে নিজেকে বিলিয়ে দিতে।

যদি-বা কখন কেউ তাঁর অন্তরঙ্গ হয়ে থাকেন, সে অন্তরঙ্গতা মূলতঃ হচ্ছে বাইরের অথবা সাময়িক। রবীন্দ্রনাথের মনের গহন তলে এমন একটি গোপন কোণ আছে, সেখানে কারোকে প্রবেশাধিকার দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। সেখানে তিনি আপনাকে নিয়ে আপনাতে পরিপূর্ণ।

বলা বাহুল্য, এই নিঃসঙ্গতার ফলে তাঁর বাইরের জীবনে জাগেনি কোন লক্ষণীয় রিক্ততা। তাঁর অন্তর্লোকের চরম বিকাশের পথেও সৃষ্টি হয়নি সর্বনাশা বাধা। তিনি নিজেই এ বিষয়ে বিচার করে দেখেছেন। একখানি চিঠিতে লিখেছেন: "আমার সত্যকার স্বভাবটা বোধ হয় নৈঃসঙ্গিক। সঙ্গের প্রভাব তাকে বল দেয় না, তাকে অলস করে। এই আলস্যের মন্থরতায় নিজের যা কিছু শ্রেষ্ঠ, সে সমস্ত আচ্ছন্ন হয়ে যায়। আর তা

থেকেই আসে ক্লান্তি। এ পর্যন্ত আমি যা কিছু শিক্ষা পেয়েছি,—সমস্তই একলা নিজের মধ্যে। আমি চিরদিন স্কুলপালানো ছেলে—জনহীন আকাশের ডাক শুনে যখনই গড়িমসি করেছি, যখনই সামনে না এগিয়ে পিছনে তাকিয়েছি, তখনই বিপদ ঘটেছে।"[১]

বিচার করে দেখলে বোঝা যায়, এই নিঃসঙ্গতার কারণ অনেকগুলি। প্রথমতঃ রবীন্দ্রনাথ শিল্পী। শিল্পীদের অন্তরে স্বভাবতঃ জন্মায় উগ্র অহমিকাবোধ। অহমিকাবোধ তাঁদের করে তোলে আত্মকেন্দ্রিক এবং আত্মসচেতন। তাঁরা কারো কাছে নিজেদের নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে পারেন না। তাই সমাজের সকল ক্ষেত্রেই গুরুশিষ্য পাওয়া যায়। পাওয়া যায় না সাহিত্যক্ষেত্রে। শিল্পীদের জীবনে সৃষ্টিপ্রেরণার মূলে থাকে আত্মরতি। তাঁদের সেই আত্মানুরাগ যেমনি প্রবল, তেমনি তীব্র তাঁদের স্বাতন্ত্র্যবোধ। তাঁরা কর্মযোগীর মত নন, নিজেকে মুছে দিয়ে সাধনার পথে এগিয়ে যান না।

রবীন্দ্রনাথ অনন্যসাধারণ প্রতিভাবান শিল্পী। তাই তাঁর স্বাতন্ত্র্যবোধও উগ্রতম এবং সূক্ষ্মতম।

মনে হয়, ছেলে বয়সে যদি তিনি মানুষের নিবিড় সংস্পর্শ পেতেন, তাহলে হয়ত এই স্বাতন্ত্র্যবোধ অনেক পরিমাণে সংযত হত। শিশু মানুষকে প্রথম কাছে পায় বাপমায়ের মধ্যে দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ ছেলেবয়সে সেই বাপমাকেই কখনও সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়ের মত একান্ত নিকটে পান নি। তিনি "জীবনস্মৃতি"তে স্বীকার করেছেন, "আমার জন্মের কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই আমার পিতা প্রায় দেশভ্রমণেই নিযুক্ত ছিলেন। বাল্যকালে তিনি আমার কাছে অপরিচিত ছিলেন বলিলেই হয়।"

মহর্ষি ছিলেন কঠোর কর্তব্যপরায়ণ এবং গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। বাড়ির লোকেরা তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন, ভয় করতেন, কিন্তু তাঁকে

১ "পথে ও পথের প্রান্তে"।

নিজেদের অন্তরঙ্গ ভাবতে পারতেন না। তাই রবীন্দ্রনাথ ও দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে নিবিড় অন্তরঙ্গতা কখনও গড়ে ওঠে নি।

তাছাড়া, সে যুগে ঠাকুরবাড়ির ছেলেরা পাড়াপড়শীর সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশা করবার সুযোগও পেতেন না। একে বিখ্যাত ধনী। তার উপর পিরালী ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীভুক্ত এবং রামমোহনের আদর্শের অনুরাগী পরিবার। সহজেই ঠাকুরবাড়ির ছেলেদের মধ্যে একটা দুর্নিবার স্বাতন্ত্র্যবোধ জেগে উঠেছিল। এই অবস্থায় প্রতিবেশী হিন্দুসমাজ কখনও তাঁদের আপনজন বলে ভাবতে পারত না। ফলে ঠাকুরপরিবারের চারিদিকে স্বভাবতঃই গড়ে উঠেছিল আত্মকেন্দ্রিকতার দুর্ভেদ্য প্রাচীর।

কুণো, কল্পনাপ্রবণ রবীন্দ্রনাথ একলা-একলা সেই প্রাচীরের মধ্যেই বড় হয়েছিলেন। বালক বয়সেও তাঁর ভাগ্যে সমবয়সী বন্ধু জোটেনি। তিনি নিজের ছাত্রাবস্থার আলোচনা প্রসঙ্গে "জীবন-স্মৃতি"তে লিখেছেন, "ছেলেদের সঙ্গে যদি মিশিতে পারিতাম তবে বিদ্যাশিক্ষার দুঃখ তেমন অসহ্য বোধ হইত না। কিন্তু সে কোন মতেই ঘটে নাই। অধিকাংশ ছেলেরই সংস্রব এমন অশুচি ও অপমানজনক ছিল যে, ছুটির সময় আমি চাকরকে লইয়া দোতলার রাস্তার দিকে এক জানালার কাছে বসিয়া কাটাইয়া দিতাম।"

সকল সমাজেই গণপ্রকৃতি মহামানুষের স্বাতন্ত্র্যকে সহ্য করতে পারে না। প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্বকে মনে করে অকারণ ঔদ্ধত্য। পারিপার্শ্বিক সমাজের চেয়ে উন্নত সংস্কৃতিধারায় প্রতিপালিত হলে জনতার কাছ থেকে যে পীড়ন মানুষকে ভোগ করতে হয়, তরুণ বয়সে রবীন্দ্রনাথের অদৃষ্টেও ঘটেছিল সেই পীড়ন। হয়ত আজও তিনি সেই দুর্গতির কবল থেকে পাননি নিষ্কৃতি।

"গল্পগুচ্ছ" পড়লে এই ধারণা জন্মায় যে, সাধারণ মানুষের সম্বন্ধে লেখকের অভিজ্ঞতা যেমন গভীর, তেমনি ব্যাপক। তিনি জনতাকে

ভালভাবেই জানেন। কিন্তু বিচার করে দেখলে মনে হয়, জীবনে তিনি জনতা সম্বন্ধে এই অভি-জ্ঞান যতটা অর্জন করেছেন বাস্তব অভিজ্ঞতার ফলে, তার চেয়ে ঢের বেশী অনুমান করে নিয়েছেন তীক্ষ্ণ কল্পনার বলে। তাঁর শিল্প-প্রতিভা এমনই অসামান্য যে, সামান্য কিছু উপকরণ সম্বল করে অনায়াসে লেখার মধ্যে তার একটি পরিপূর্ণ রূপ ফুটিয়ে তুলতে পারেন। কল্পনার রাজা তিনি।

এ কথা সত্যি, রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘজীবনে দেশেবিদেশে হাজার হাজার মানুষের সংসর্গে এসেছেন। নানা তাঁদের জাত, নানা তাঁদের মনের গড়ন। তাঁদের সামাজিক স্তরও বিচিত্র। তবু বলব, মূলতঃ সে সংসর্গ সংস্রব মাত্র, সংস্পর্শ নয়। তিনি কাছে পেয়েছেন খুব কম মানুষকে, হয়ত কাছে টেনেছেনও খুব কম মানুষকে। তাই মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করতে গিয়ে তাঁর চালচলনে প্রায়ই সংগোপনে ফুটে ওঠে একটা সংকোচের ভাব। সে সংকোচ তাঁর অভিনয় নয়, স্বভাবজাত।

*

*   *

রবীন্দ্রনাথকে যতই দেখেছি, ততই তাঁকে হেঁয়ালি বলে মনে হয়েছে। তাঁর ব্যক্তিত্ব ভয়ংকর elusive। তা যেন 'নিতুই নব'। বুঝেও বোঝার শেষ হয় না। তার কারণ, তাঁর অন্তরে আছে একটি মানুষ নয়, অনেকগুলি মানুষ। তাই তিনি জীবনের বিভিন্ন দিকের সাধনায় প্রেরণা পেয়েছেন, বিচিত্র ক্ষেত্রে নিয়োগ করতে পেরেছেন সৃষ্টি শক্তিকে।

বলা বাহুল্য, এই বৈশিষ্ট্য শুধু তাঁর একার নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলাদেশকে কেন্দ্র করে ভারতের যে নবজাগরণ ঘটেছিল, সেই রেনেসাঁস-এর প্রায় সব কয়জন মহারথীরই ছিল জটিল চরিত্র। রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ—সকলেরই অন্তরে ছিল নানা খণ্ডসত্তা। সকলেরই প্রতিভা ছিল

বিচিত্র-ধর্মী। তাঁরা নানা সাধনার মধ্য দিয়ে জীবনের পরম রস আস্বাদনের চেষ্টা করেছিলেন। লাভও করেছিলেন বিচিত্রসিদ্ধির মালা।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব হচ্ছে, তাঁর ব্যক্তিসত্তার মধ্যে শুধু নানা খণ্ড-সত্তাই নেই,—আছে বিচিত্র, বিপরীত খণ্ড-সত্তার সমাবেশ। এদিক থেকে তিনি একেবারে স্বতন্ত্র। তাঁর চরিত্র হচ্ছে ভয়ংকর জটিল। যেন একটি গোলাকার গোলক ধাঁধা, যার পরিধির মধ্যে আছে বিচিত্র-কেন্দ্রিক অনেকগুলো গোলক।

ইতিপূর্বে দৈনন্দিন জীবনে মহাকবির কর্মব্যস্ততার আলোচনা করেছি। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, মাঝে মাঝে সেই একটানা কাজের মালায়ও ঘটে বিশৃঙ্খলা। হঠাৎ অজানা কারণে তাঁর ভিতরে জেগে ওঠে কর্মবিমুখতা। তখন কাজের বদলে আসে কাজ না-করার পালা। এমন অবস্থায় ভিতরের বারান্দায় চৌকি পেতে হয়ত তিনি চুপ করে বসে থাকেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে কি যেন একমনে দেখেন। জানালার ধারে কখন-বা একটা কাক ডেকে যায়। কখন-বা এক ঝলক দক্ষিণা বাতাসে গাছে গাছে জাগে শিহরণ। দূরের রাঙামাটির রাস্তা দিয়ে সশব্দে চলে গরুর গাড়ি। তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই সব লক্ষ করেন। খাবার সময় উত্তরে যায়। রাতের ঘুম দূরে পালায়। এমনি অবস্থায় বাইরের সঙ্গে তাঁর অন্তরের চলে নিঃশব্দ যোগাযোগ।

তাঁর এই অবস্থার একটি অপ্রত্যক্ষ চমৎকার ছবি ফুটে উঠেছে তাঁর লেখা একখানি সুপরিচিত ভালবাসার গানে :

"হেলাফেলা সারাবেলা একি খেলা আপন-সনে।"

বলা বাহুল্য, কর্মব্যস্ততার রবীন্দ্রনাথ আর কর্মবিমুখতার রবীন্দ্রনাথ দুইই এক মহাসত্তা। তাঁর চরিত্রে এমনি ধারা আরও অনেক বিপরীতের সমাবেশ আছে।

যাকে চলিত কথায় বলে মেজাজী, রবীন্দ্রনাথ তেমন মানুষ নন। তবু তাঁর আছে নানা মেজাজ। দেখেছি, সাধারণতঃ অনেক সময়েই তিনি সদালাপী, হাসিখুশী। তখন তাঁর আলোচনার অবারণ কথাস্রোত, তাঁর সাবলীল, অলংকারভরা ভাষা, তাঁর উইট-এর ঝলকানি, তাঁর চিন্তার সহজ সমৃদ্ধি দেখে অতিথি-অভ্যাগতেরা অভিভূত না হয়ে পারেন না। কিন্তু এই রূপ তাঁর প্রকৃতির একমাত্র রূপ নয়। কখন-কখন আবার তিনি সম্পূর্ণ বদলে যান। তখন তাঁর গাম্ভীর্যে-অটল মুখে দীপ্তি পায় আত্মসমাহিত ভাব। সেই অবস্থায় তাঁকে দেখে মনে সন্দেহ জাগে, ইনি কি কথার রাজা মহাকবি না আর কেউ? কোন্‌টি রবীন্দ্রনাথের আসল রূপ?

তাঁর চরিত্রের আর একটি হেঁয়ালির কথাও উল্লেখ করি।

বাইরের অনেকে তাঁকে বিরাট ব্যক্তিত্বে-দীপ্ত মানুষ বলে জানেন। অন্ততঃ স্বভাবতঃ তিনি তা-ই। কিন্তু ঘরোয়া জীবনে সময়ে সময়ে তিনি এমন লাজুক প্রকৃতির মানুষের মত ব্যবহার করেন যে, তা দেখে অবাক না হয়ে থাকা যায় না। একদিন তিনি একজন অতিথির সঙ্গে আলোচনা করছিলেন। অতিথি অন্য-মনস্কতাবশতঃ কথা বলতে বলতে বুঝতে পারেন নি যে, দেরি হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে মহাকবির বাথ রুমে যাবার প্রয়োজন হল। তখন তিনি মূত্রাশয়ের অসুখে ভুগছিলেন। তবু অতিথিকে বলে বাথ রুমে যেতে পারলেন না। পরম ধৈর্যের সঙ্গে চুপ করে বসে থাকলেন। শুনেছি, এর ফলে তাঁর অসুখ বেড়ে গেছল।

বারবার দেখেছি, তিনি অতি সামান্য মানুষের সাধারণ কথার উৎসাহে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। আবার সেই অনুপাতে সামান্য নিন্দায়ও বিচলিত হয়ে পড়েন। মনে আছে, একদিন কথায় কথায় তাঁকে বলেছিলুম, বাঙলা দেশে জন্মে সাতাত্তর বছর বয়সে আপনি সারাদিন কাজ করেন, দুপুরে দিবানিদ্রার কুড়েমি নেই। শান্তি-নিকেতনে এসে যা দেখলুম, এর তুলনা হয় না। আশ্চর্য, দূর

থেকে আপনার বিষয়ে লোকে কত ভুল ধারণা করে। এখানে না এলে হয়ত বুঝতেই পারতুম না—

মহাকবি আমার মুখের কথাটি লুফে নিয়ে তাড়াতাড়ি বললেন, এখানে না এলে হয়ত নয়, নিশ্চয়ই তুমি আমাকে খুব গালাগালি দিতে।

আমরা জোরে হেসে উঠলুম।

তিনি বলতে লাগলেন, গালাগালি দিয়ে লাভ হয়, এ আমি ছাড়া আর কারো ক্ষেত্রে নেই। গান্ধীজীকে গালাগালি দিলে লোকে সহ্য করে না। চিত্তরঞ্জন[১]কে দিলে জানে মাথা আস্ত রাখা যাবে না। এমন কি যেসব সাহিত্যিক বহুকাল আগে মারা গেছেন,—সেই নবীন,[২] হেম[৩]কে গালাগালি দিলেও আপত্তি ওঠে। কিন্তু আমাকে গালাগালি দিলে শুনতে পাই, লোকের লাভ হয়।

আমি হালকাভাবে বললুম, বোধ হয়, আপনার বন্ধুর স্থানে শনিগ্রহ আছেন।

রবীন্দ্রনাথ হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন, ঠিক বলেছ। তবে বন্ধুর স্থানে নয়,—কর্মস্থানে। আমি যাই করি না কেন, প্রথমটা খুব গালাগালি খাব। এতে অবশ্য শেষ পর্যন্ত কিছু করতে পারে না। পরে নিজে থেকেই থেমে যায়। আশ্চর্য হয়ে ভাবি, কেন এ? তবে এই অসুখের পর থেকে আমার মনে এমন একটা ভাব এসেছে যে, গালাগাল শুনলে আর কিছু কষ্ট হয় না। মনু বলেছেন, প্রশংসাকে বিষবৎ আর নিন্দাকে বন্ধুর মত মনে করবে। কেন জানি না, অসুখের পর থেকে প্রশংসা শুনে যেমন বিশেষ চঞ্চল হই না, নিন্দাও আমাকে আর কিছু করতে পারে না।

শেষের কথাগুলি তাঁর মনের আকাঙ্ক্ষার কথা। কি হবার তিনি চেষ্টা করেন, তার পরিচয়। আগেকার কথাগুলির মধ্যে

১ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। ২ কবি নবীনচন্দ্র সেন।
৩ কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

তাঁর চরিত্রে যে নিন্দা-সহিষ্ণুতার অভাব দেখা যায়, তা তাঁর সাধারণ জীবনে বেশ প্রকট।

তবু একথাও স্বীকার করব, তাঁর বাইরের সত্তায় আছে যেমন নানা দুর্বলতা, তাঁর অন্তর্সত্তায় আছে তেমনি সে দুর্বলতাকে সংযত করার শক্তি। একটি তাঁর হয়ত জন্মগত স্বভাবের ফল, আর একটি তাঁর আজীবন সাধনার পরিণতি।

*

* *

আগেই বলেছি, ঘরোয়া জীবনে রবীন্দ্রনাথ খুব সাদাসিদে মানুষ। জাঁকজমক, আড়ম্বরের মধ্যে তাঁর যেন হাঁফ ধরে। ছোট ঘর, সামান্য আসবাব, দু একজন চাকর। এই পরিমণ্ডলে একলাএকলা তাঁর দিন কাটে। লেখার তাগিদ যখন আসে, কোন আড়ম্বরেরই দরকার হয় না। না রেশমী পোশাক, না হাল আমলের কোচকেদারা, না-বা ঝকঝকে, তকতকে দামী আসবাব সজ্জা।

একদিনের কথা মনে পড়ে। বৈশাখ মাস। দুপুর বেলা। শান্তিনিকেতনের কাঁকর-ভরা মরু-মাটি যেন তেতে আগুন হয়ে উঠেছে। বাতাসে ছুটছে শুখনো আগুনের ফুলকি। বাড়িতে বাড়িতে দরজা জানালা সব বন্ধ। হয়ত অনেকেই শুখনো তাপের জ্বালা এড়াবার জন্য অন্ধকার ঘরে বিশ্রাম করছেন। এমন সময়ে কাজের সূত্রে তাঁর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলুম।

তিনি তখন 'পুনশ্চে'র উত্তর দিকে বারন্দায় বসে "বিজ্ঞান পরিচয়" বইখানি লিখছিলেন। ঘরের সমস্ত জানালা খোলা। গায়ে রয়েছে একটা ফিকে, গৈরিক রঙের খদ্দরের পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবির গলার কাছে দু-একটি বোতাম খোলা। ঘরে না-ছিল বিজলী পাখা, না-বা খসখস। আমি অবাক হয়ে গেলুম। পরিপূর্ণ বার্ধক্যে এমন ভাবে তাঁকে কাজ করতে দেখব, আশা করিনি। মনে হল, এ ত প্রায় ধর্ম-সাধকের কৃচ্ছ্র-সাধনা!

বিস্ময় প্রকাশ করতেই তিনি বললেন, ওই তোমাদের এক কথা! গরম ত পড়েছে, কিন্তু বাংলাদেশের ছেলে, কার কাছে গরমের নালিশ জানাব? পাহাড়ে দেশে ত আর জন্ম হয় নি।

তারপর কথাটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, তোমরা আজকালকার শহুরে ছেলেরা বড় শৌখিন হয়ে যাচ্ছ। কষ্ট সহ্য করতে পার না। গরমকে গরম-গরম বললেই ত তা চেপে ধরে। গরম যখন লাগবে, তখন কাজে লেগে যেতে হয়। কাজের মধ্যে ডুব দিতে পারলে, গরম ঠাণ্ডা কিছুই আর মনে থাকে না।

এই রবীন্দ্রনাথকেই আর একদিন দেখেছি সম্পূর্ণ বিপরীত মূর্তিতে। শান্তিনিকেতনে সেদিন ছিল বসন্তোৎসব। ১৯৩৭ সাল। ২৫ মার্চ তারিখ।

ভোরের আকাশে আলোর আভাস ফুটে উঠেছিল কিনা সন্দেহ। এমন সময় ঘুম ভেঙে গেল: শুনতে পেলুম, বৈতালিক দল উৎসব দিনের আগমনী গেয়ে চলেছেন,

"আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে,
তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে,
করো না বিড়ম্বিত তারে।"

চমকে উঠলুম। আলোআঁধারির সেই সন্ধিক্ষণে কিসের যেন এক অজানা সাড়ায় অকালে-ঘুম-ভাঙা, আলসে মন সজাগ হয়ে উঠল। আমি আবেগে ঘরের বাইরে বেরিয়ে পড়লুম।

তখন গাছে গাছে পাখিরা শুরু করেছে গানের মহোৎসব। শাল মহুয়ার ডালে ডালে দেখা দিয়েছে কচি কিশলয়। আশ্রমে এসেছি প্রায় ছ-সাত মাস হল। এমন করে কোন দিন ত মনের মধ্যে প্রকৃতির আকর্ষণকে অনুভব করিনি! শহুরে মানুষ আমরা, এই মধুর আবেগ, এই রসঘন আনন্দ থেকে কত অনায়াসে না নিজেদের বঞ্চিত করে রাখি! মনে পড়ল কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের

পরিচিত বাণী, "What man has made of man!" (মানুষ নিজেকে নিয়ে এ কি সৃষ্টি করেছে!)

বসন্তোৎসবের অনুষ্ঠান ছিল দুবেলাতেই—সকালে এবং সন্ধ্যায়। সকালের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল শালবীথি এবং আম্রকুঞ্জে।

ঘণ্টা দুয়েক পরে শালবীথিতে এসে উপস্থিত হলুম। দেখতে পেলুম, কতকগুলি গাছের তলায় মঙ্গল ঘট রাখা হয়েছে। আর 'শ্রীভবনে'র ছাত্রীরা চলেছেন শোভাযাত্রা করে। তাঁরা নাচের তালে তালে পা ফেলে সেই ঘটগুলিতে আবির দিতে দিতে গাইছেন ঃ

"ওরে গৃহবাসী, খোল্ দ্বার খোল্, লাগল যে দোল।
স্থলে জলে বনতলে লাগল যে দোল।
দ্বার খোল্, দ্বার খোল্॥
রাঙা হাসি রাশি রাশি অশোকে পলাশে,
রাঙা নেশা মেঘে মেশা প্রভাত-আকাশে,
নবীন পাতায় লাগে রাঙা হিল্লোল।
দ্বার খোল্, দ্বার খোল্॥"

শোভাযাত্রার ছাত্রীরা শেষে উপস্থিত হলেন আশ্রমের আম্রকুঞ্জে। সেখানে সভার আয়োজন করা হয়েছিল।

মণ্ডপের তকতকে, ঝকঝকে করে নিকোনো জমির উপর ছিল অপরূপ আঁকাবাঁকা রেখার আলপনা। আলাপনার মাঝখানে মাটির ঘট বসানো, তার মাথায় গোছা গোছা ফুল। কুঞ্জের মধ্যে ছিল একটি ছোট বেদী। সেই বেদীর উপর বসেছিলেন স্বয়ং মহাকবি।

ছাত্রীরা শোভাযাত্রা শেষ করে একে একে তাঁর পায়ে আবীরের অর্ঘ দিতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে চলল বীণার ঝংকার।

তারপর রবীন্দ্রনাথ "বনবাণী" থেকে আবৃত্তি শুরু করলেন ঃ

"হে বসন্ত, হে সুন্দর, ধরণীর ধ্যানভরা ধন,
বৎসরের শেষে
শুধু একবার মর্ত্যে মূর্তি ধরো ভুবনমোহন,
নব বরবেশে।
তারি লাগি তপস্বিনী কী তপস্যা করে অনুক্ষণ
আপনারে তপ্ত করে, ধৌত করে, ছাড়ে আভরণ,
ত্যাগের সর্বস্ব দিয়ে ফল-অর্ঘ করে আহরণ
তোমার উদ্দেশে।"

আবৃত্তি শুনতে শুনতে হঠাৎ চোখে পড়ল মহাকবির সেদিনকার অপরূপ বেশ। তাঁর অঙ্গে ছিল বাসন্তী রঙের দামী রেশমী ধুতি আর পাঞ্জাবি। মাথার উপরকার সাদা চুলগুলি পরিপাটী করে আঁচড়ানো। চোখে মুখে খুশির অপূর্ব দীপ্তি। যেন উৎসবের আনন্দ-ভরা তাঁর মন দেহের অঙ্গে অঙ্গে প্রস্ফুট হয়ে উঠেছে। দৃষ্টিতে সুগভীর তন্ময়তা।

আশে পাশে রয়েছে আশ্রমের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা। তারা পরেছে সাধারণ ধুতি আর শাড়ী। দৈনিক বেশের সঙ্গে আজকের সাজের তফাত এই যে, মেয়েদের শাড়ী আর ছেলেদের চাদর বাসন্তী রঙে ছোপানো। মনে পড়ল, সাধারণতঃ সভায় বা অভিনয়-মঞ্চে রবীন্দ্রনাথের এই রেশমী বেশ দেখেই লোকে ভাবে, তিনি ভয়ংকর বিলাসী,—বিপুল আড়ম্বরের মধ্যে বুঝি তাঁর দিনগুলি কাটে।

সেদিন আমারও মনে এই প্রশ্ন জেগেছিল, অর্থের দাসত্বের চেয়ে মহৎ চিন্তায় জীবন কাটানোর আদর্শে যিনি পরম নিষ্ঠাবান, সেই আদর্শে দেশের ছেলেমেয়ে গড়ার কাজে যিনি নিজের জীবন ধন সমর্পণ করেছেন, এই কি সেই রবীন্দ্রনাথ?

এই অঘটনের মূল রয়েছে তাঁর চরিত্রের মধ্যেই। তিনি নিজের

দুর্লভ দৈহিক রূপ সম্বন্ধে খুব সচেতন। তাঁর শিল্পরুচি সেই সৌন্দর্যকে যথাসাধ্য ফুটিয়ে না তুলে তৃপ্ত হতে পারে না। হয়ত সকল মানুষের মনেই কমবেশী গ্রীক নার্‌সিসাস লুকিয়ে আছেন। কর্মযোগী বা জ্ঞানযোগীদের অন্তরেই তাঁর লীলা সব চেয়ে প্রকট। নিজের সম্বন্ধে মোহ নেই—এমন মানুষ জগতে দুর্লভ। কবি এবং যোগীর জীবনে তা প্রকাশ কর'র উপায় হয়ত বিভিন্ন। কিন্তু কোন না কোন উপায়ে এই আত্মরতি প্রকাশ পায়ই।

মানুষ রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব হচ্ছে, তিনি হয়ত এই দেহগত আত্মমোহকে করেছেন sublimated (সমুদ্গত)। জীবনসাধনার পরম অনুভূতির দীপ্তিতে নিজের দেহের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন দেহাতীতকে। ফলে, তাঁর মধ্যে সাধারণ দেহ-রতি পরিণত হয়েছে পরম দেহপ্রীতিতে। মনে হয়, তাই তিনি দেহসজ্জা সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে পারেন না। তিনি যে খোঁজ পেয়েছেন "তোরি ভিতর অতল সাগর।"

রবীন্দ্রনাথের ভিতরে এই জটিলতার আরও একটি বিশেষ কারণ আছে। মনে হয়, ঘরোয়া জীবনের সারল্য এবং বাইরের জীবনের সাড়ম্বরতা কোনটাই তাঁর কৃত্রিমতা নয়। দুইই এক সঙ্গে তাঁর ব্যক্তি-সত্তার আসল রূপ। তাঁর চরিত্রের মূলে আছে বিপরীত দুটি শক্তিধারা। একটি গঙ্গা, আর একটি যমুনা। একটি ভোগানন্দ, আর একটি বৈরাগ্য। একটি শিল্পী মনের সহজ জীবনতৃষ্ণা, আর একটি ধর্মসাধকের আসক্তিহীনতা। একটির আদিতে রয়েছেন প্রিন্স দ্বারকানাথ, আর একটির আদিতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথ বহুরূপী নন। কিন্তু বহু তাঁর ব্যক্তিত্বের রূপ। তাঁর এই বিচিত্র, বিরোধী খণ্ড-সত্তাগুলি নানা জাতের, নানা আকারের। কেউ সাদা, কেউ কাল। কেউ ক্ষীণ, কেউ প্রচণ্ড। অথচ প্রত্যেকটি এত সুস্পষ্ট এবং সুবিকশিত যে তারা পরস্পরের মধ্যে নিঃশেষে মিলিয়ে যেতে পারেনি। তাই মহাকবির চিত্ত-সমুদ্রে তাদের

রাসায়নিক মিলন ঘটা সম্ভব হয়নি। তারা পাশাপাশি আপন আপন স্বকীয়তায় বিরাজ করছে।

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ জন্মের সঙ্গে খণ্ড-সত্তাগুলির দোষগুণ তাঁর মত বিশাল আধারের অনুপাতেই পেয়েছেন। তবু জীবনে তিনি নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকেননি। অবিরাম আত্মবিচার এবং প্রচণ্ড ইচ্ছা-শক্তির সাহায্যে বরাবর দোষগুলির দমন এবং গুণগুলির বিকাশের সাধনা করে এসেছেন।

এরূপ চেষ্টায় স্বভাবতঃ যা ফল পাওয়া যায়, তাঁর অদৃষ্টেও তাই ঘটেছে। তাঁর কতকগুলি সাধনা সিদ্ধ হয়েছে, কতকগুলি হয়েছে ব্যর্থ। তিনি কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্বলতা অংশতঃ চাপতে পেরেছেন, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তা চাপতে গিয়ে নতুন সমস্যা জাগিয়ে তুলেছেন। এক হয়েছে ক্ষীণ, আর এক হয়েছে প্রবল। কিন্তু প্রধান প্রধান বিরুদ্ধ শক্তিগুলির কোনটাই একেবারে লুপ্ত হয়নি। তাই তাদের ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁর অন্তর্লোকে সৃষ্টি হয়েছে নানা দুর্নিবার বিরোধ।

মহাকবি নিজের অন্তর্‌সত্তার এই বিশিষ্টতাকে একখানি চিঠিতে চমৎকার বর্ণনা করেছেনঃ "আমার বীণায় অনেক বেশী তার— সব তারে নিখুঁত সুর মেলানো বড় কঠিন। আমার জীবনে সব চেয়ে কঠিন সমস্যা আমার কবি-প্রকৃতি। হৃদয়ের সব অনুভূতির দাবিই আমাকে মানতে হল। কোনটাকে ক্ষীণ করলে আমার এই হাজার সুরের গানের আসর সম্পূর্ণ জমে না। অথচ নানা অনুভূতিকে নিয়ে যাদের ব্যবহার, জীবনের সোজা রথ হাঁকিয়ে চলা তাদের পক্ষে একটুও সহজ নয়। এ যেন একা গাড়িতে দশটা বাহন জুতে চালানো। তার সবগুলোই যদি ঘোড়া হত, তাহলে একরকম করে সারথ্য করা যেতে পারে। মুশকিল এই যে, এর কোনটা উট, কোনটা হাতি, কোনটা ঘোড়া, আবার কোনটা ধোবার বাড়ির গাধা,—ময়লা কাপড়ের বাহক। এদের সকলকে একরাশে

বাগিয়ে একচালে চালাতে পারে, এমন মল্ল কজন আছে! কিন্তু আমি যদি নিছক কবি হতুম, তাহলে এজন্যে মনে ভাবনাও থাকত না। এমনকি যখন ঘাড়ভাঙা গর্তের অভিমুখে বাহনগুলো চার পা তুলে ছুটত, তখন অট্টহাস্য করতে পারতুম।

"এমন সবল, মরীয়া কবি সংসারে মাঝে মাঝে দেখা যায়, তারা স্পর্ধার সঙ্গে বলতে পারে, স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ। কিন্তু আমার স্বধর্ম কি, তা নিয়ে বিতর্ক আর ঘুচল না। এটুকু প্রতিদিনই বুঝতে পারি, কবিধর্ম আমার একমাত্র ধর্ম নয়।

"রস বোধ এবং সেই রসকে রসাত্মক বাক্যে প্রকাশ করেই আমার খালাস নয়। অস্তিত্বের নানা বিভাগেই আমার জবাব দিহি। সব হিসাবকে একটা চরম অঙ্কে মেলাব কি করে! যদি না মেলাতে পারি, তাহলে সমস্যা অত্যন্ত কঠিন বলে ত পরীক্ষক আমাকে পার করে দেবেন না। জীবনের পরীক্ষায় ত হাল আমলের বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্য পাওয়া যায় না। আমার আপনার মধ্যে এই নানা বিরুদ্ধতা বিষম দৌরাত্ম্য আছে বলেই আমার ভিতরে মুক্তির জন্যে এমন নিরন্তর এবং এমন প্রবল কান্না।"[১]

১ "পথে ও পথের প্রান্তে"।

॥ সাত ॥

বিশ্বের ইতিহাসে কোন মহাসত্তায় অসাধারণ পরিমাণ বুদ্ধি, হৃদয়াবেগ এবং অতীন্দ্রিয়তার একত্র সমাবেশ ঘটেছে কদাচিৎ। কিন্তু গোড়া থেকেই রবীন্দ্রনাথের অন্তর্লোকে ঘটেছে এই বিপরীতের অসামান্য জোট। আশ্চর্য এই যে, তারা একত্রে থেকেও একাত্ম হয়ে যায়নি। মহাকবির মানসভূমিতে তারা এক মূলে অবস্থান করেও প্রায় সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধারায় সুবিকশিত হয়ে উঠেছে।

আমার ধারণা, ব্যবহারিক জীবনে রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ বুদ্ধিপ্রধান মানুষ। সংসারের বাস্তব ভিত্তির উপর আছে তাঁর প্রখর দৃষ্টি। তাঁর আচারব্যবহার, চালচলন, মতামত নিয়ন্ত্রিত হয় মোটামুটি যুক্তির পথে। তিনি সাধারণতঃ আবেগবশে বিশেষ কোন কাজ করেন না। একটু কাছাকাছি যেতে পারলে বোঝা যায়, তাঁর ভিতরে চলেছে অহরহ আত্মবিচার। তাঁর লেখা চিঠিগুলোর বৈশিষ্ঠ্য হচ্ছে, তারা মূলতঃ খবরের চিঠি নয়। তারা হচ্ছে তাঁর মনের সাময়িক ছবি। তিনি যে নিজেকে নিয়ে নিয়ত বিচার করেন, তার পরিচয় পাওয়া যায় "পত্রধারা"র পাতায় পাতায়।

একখানি চিঠিতে তিনি এ বিষয়টি চমৎকার ভাবে আলোচনা করছেন। লিখেছেন, "আমার জীবনে নিরন্তর ভিতরে ভিতরে একটি সাধনা ধরে রাখতে হয়েছে। সে সাধনা হচ্ছে আবরণ মোচনের সাধনা, নিজেকে দূরে রাখার সাধনা। আমাকে আমি থেকে ছাড়িয়ে নেবার সাধনা। স্থির হয়ে বসে একথা প্রায়ই আমাকে উপলব্ধি করতে হয় যে, যে আমি প্রতিদিনের সুখদুঃখে, কর্মেচিন্তায় বিজড়িত, সে ঐ সংখ্যাহীন অনাত্মের নিরুদ্দেশ স্রোতে ভেসে যাওয়ার সামিল। তাকে দ্রষ্টারূপে স্বতন্ত্রভাবে দেখতে পারলেই ঠিক দেখা হয়। তার সঙ্গে নিজেকে অবিচ্ছিন্ন এক করে জানাই মিথ্যে

জানা। আমার নিজের মধ্যেই বড় আছে, যে দ্রষ্টা; আমার নিজের মধ্যে ছোট হচ্ছে, ভোক্তা।”[১]

দৈনন্দিন জীবনে রবীন্দ্রনাথ যে কত বুদ্ধিপ্রধান মানুষ, তা স্পষ্ট হয়ে উঠত যখন কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে যেতুম। বিপরীতকে পাশাপাশি রেখে না দেখতে পারলে অনেক সময় যথার্থ রূপটি চোখে পড়ে না।

শরৎচন্দ্র ছিলেন এমন সত্তা “whom the analysing, logical, discoursing intellect tells little or nothing; sense, passion and imagination are the avenues by which such minds attain to truth.” তাঁর চালচলন, কথাবার্তা ও মতামত প্রকাশের মূলে থাকত প্রধানতঃ সহজ-বোধ, কল্পনা আর প্রখর হৃদয়াবেগ। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি যখন তর্ক করতেন, আপাত দৃষ্টিতে তা যুক্তি বলে মনে হলেও বিশেষ বিচার করলে বোঝা যেত, তার মূলে আছে হৃদয়াবেগ,—বুদ্ধির প্রভাব নয়। কিন্তু মানুষ রবীন্দ্রনাথের আচরণ হচ্ছে ঠিক এর বিপরীত।

এঁদের দুজনের লেখা গদ্য প্রবন্ধ পড়লেও এই বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। শরৎচন্দ্রের প্রবন্ধ আগাগোড়া হৃদয়াবেগের ভিত্তির উপর রচিত। সেখানেও তিনি ঔপন্যাসিক। বিচারের চেয়েও পাঠকদের মনে নিজের বক্তব্যের প্রতি বিশ্বাস জাগাবার (illusion of reality) দিকে বেশী ঝোঁক।

অথচ রবীন্দ্রনাথের সামাজিক, রাজনৈতিক অথবা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে প্রবন্ধগুলিতে দেখা যায় যুক্তির প্রাধান্য। এই রচনাগুলির ভাষা হয়ত-বা আধুনিক কালের দৃষ্টিতে একটু কাব্যগন্ধী কিন্তু আলোচনার পদ্ধতি কবিহৃদয়ের নয়। মূলতঃ প্রবন্ধলেখক রবীন্দ্রনাথ যেন কবি রবীন্দ্রনাথ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ।

হয়ত একথা বলা ভুল হবে না যে, বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের

১ “পথে ও পথের প্রান্তে”।

প্রবন্ধগুলির প্রচার তেমন ঘটেনি। আমরা তা সচরাচর খুব কম পড়ি। হয়ত এর একটি কারণ হচ্ছে আধুনিক যুগে অত্যধিক সাহিত্যরসহীন পত্রপত্রিকা পড়ার অভ্যাসবশতঃ পাঠকেরা এই প্রবন্ধগুলির সাহিত্যরসে-ভরা ভাষার মধ্যে তেমন আগ্রহের আকর্ষণ খুঁজে পান না। মনে সাহিত্য পড়ার আগ্রহ জাগলে আমরা সচরাচর কাব্য পড়ি, পড়তে চাইনা কাব্যিক গদ্য।

তা যাই হোক, এ কথা সত্য যে, কথাশিল্পীর লেখা প্রবন্ধ প্রধানতঃ আমাদের বুকে সাড়া জাগায়, মহাকবির প্রবন্ধ মাথায়।

হাস্যরসের বিচার করলেও দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথের সাধারণ প্রকৃতি খুব বুদ্ধিপ্রধান।

যে লেখক হৃদয়াবেগ প্রধান, তাঁর সাহিত্যে হাস্যরস প্রধানতঃ রসঘন হয়ে ওঠে হিউমারে। মানুষের জীবনের দিকে দিকে আছে কত না সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর অসংগতি। তিনি তা মূলতঃ হৃদয় দিয়ে অনুভব করেন। রচনার মধ্যে সেই অসংগতি নিয়ে হাসেন বটে, কিন্তু সে হাসির গোপন তলে লুকিয়ে থাকে পরম দরদ।

কিন্তু যে লেখক বুদ্ধিপ্রধান, তিনি জীবনের অসংগতিকে লক্ষ করেন যুক্তির পথে। তাঁর লেখায় হাস্যরস রূপায়িত হয়ে ওঠে ব্যঙ্গ এবং উইটে। সে হাস্যরস বুদ্ধির প্রখর আলোকে উজ্জ্বল।

রবীন্দ্রসাহিত্যে হাস্যরসের চরম প্রকাশ ঘটেছে ব্যঙ্গ এবং উইটে। তাঁর লেখায় হিউমার নেই, তা নয়। কিন্তু শরৎচন্দ্রের হিউমারের মত তা খুব উঁচুজাতের নয়। রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধিপ্রধান মন বাংলাসাহিত্যে সৃষ্টি করেছে তীক্ষ্ণতম দীপ্তিভরা উইট আর ব্যঙ্গ।

ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর কথাবার্তা যে শ্রোতাদের এত মুগ্ধ করে তার বিশেষ কারণ হচ্ছে, তা সব সময়ে 'উইটে'-উজ্জ্বল।

জটিল-প্রকৃতি মানুষের অন্তর্লোকের মধ্যে থাকে অন্তর্লোক। রবীন্দ্রনাথের মনের গহন-গভীরে আছে প্রচণ্ড হৃদয়াবেগ। এই আবেগপ্রবণতার অস্তিত্বের জন্যই তিনি পেয়েছেন অসামান্য কাব্য-প্রেরণা। প্রখর বুদ্ধি এবং প্রবল হৃদয়াবেগ একত্রে তাঁর হৃদয়ে আছে বলেই তিনি একাধারে হতে পেরেছেন কবি ও প্রবন্ধলেখক, কথাশিল্পী ও নাট্যকার।

রবীন্দ্রনাথের জীবনে মানুষের সংস্রব আর বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গ নিয়ে আছে একটি নিগূঢ় দ্বন্দ্ব। তাঁর ভিতরের একটি সত্তা কেবলই তাঁকে চেয়েছে লোকালয়ের বাইরে নিয়ে যেতে,--প্রলুব্ধ করেছে সংসারের সুখদুঃখ, আশা-হতাশা, লাভালাভের সংকীর্ণতা থেকে

The day's voice
is muffled by its
own loud glare

মহাকবির একটি অপ্রকাশিত বাণী। গ্রন্থকারকে লেখা একখানি চিঠির মধ্যে আছে।

বিদায় নিয়ে প্রকৃতির উদার আশ্রয়ে বাসা বাঁধতে,—যেখানে দিনের পর দিন প্রত্যহের আনন্দ ও মালিন্যে অসংখ্য মানুষের বিচিত্র প্রাণলীলা প্রবাহিত হচ্ছে, সেখান থেকে সৌন্দর্যলোকের নিভৃত উৎসবে। সেখানে তাঁর অন্য কোন কামনা নেই, তিনি হবেন শুধু জীবনদেবতার 'মালঞ্চের মালাকার'। তিনি চেয়েছেন বাইরের প্রাঙ্গণে মালঞ্চের কোলে একটুখানি স্থান, যাতে জীবননিকেতনের ভিতরের ভিড়ের সংস্রবে আসতে না হয়।

অথচ মহাকবির আর একটি সত্তা বারে বারে তাঁকে ঠেলে দিয়েছে এই ভিড়ের মধ্যে হাটের কোলাহলে। তাঁর ভিতরে জাগিয়েছে "মানুষের বৃহৎ জীবনকে বিচিত্রভাবে নিজের জীবনে উপলব্ধি করবার ব্যথিত আকাঙ্ক্ষা।"[১] তিনি চেয়েছেন ঝাঁপিয়ে পড়তে যেখানে জীবনধারা মুহূর্তে মুহূর্তে আবর্ত তুলে হাসিকান্নায় ফেনিল হয়ে উঠছে। চিত্তের এমনি অবস্থায় মহাকবি গেয়েছেন,

"মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।"

তাঁর কাব্যে বারবার এই সুর ধ্বনিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, "আমার সব অনুভূতি ও রচনার ধারা এসে ঠেকেছে মানবের মধ্যে। বারবার ডেকেছি দেবতাকে, বারবার সাড়া দিয়েছেন মানুষ, রূপে এবং অরূপে, ভোগে এবং ত্যাগে।"[২] তাই বারবার অন্তরের তাগিদে তিনি মানুষের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। শহর ছেড়ে পল্লীগ্রামে তাঁর কাজের কেন্দ্র স্থাপন করেছেন। তাঁর নিঃসঙ্গ, আত্মমুখী জীবনধারাকে বহুর জীবনধারার অতলে ডুবিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন।

তবু বলব, মানুষগোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ প্রধানতঃ বুদ্ধির,—হৃদয়ের নয়। তিনি দুর্গতদের দুঃখে তীব্র আঘাত অনুভব করেন, কিন্তু সে আঘাত সব চেয়ে কল্লোলিত হয়ে ওঠে তাঁর বুদ্ধির ক্ষেত্রে মানুষের বেদনায় তিনি যত কাতর হন, তার চেয়ে বেশী হন ক্ষুব্ধ। শিলাইদহে বাসকালে প্রজাদের উন্নতির জন্য যেসব প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তা পড়লে মনে হয়, দুঃখীর চেয়েও সমাজের দুঃখটাই তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল বেশী। মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহারে যে অন্যায়, অবিচার এবং অত্যাচারের অসংগতি রয়েছে, তাই তাকে সব চেয়ে পীড়া দিয়েছিল। দুর্গতদের

১ "জীবনস্মৃতি"।

২ দিলীপকুমার রায়কে লেখা চিঠি।

চেয়ে দুর্গতিকারীদের দিকেই তাঁর বেশী লক্ষ। তাঁর হৃদয়ে অসংগতি-বোধ যত সক্রিয় (dynamic), মমতা তত নয়।

সকল দেশেই সমাজসংস্কারক লোকগুরুদের মধ্যে দু রকমের প্রতিভা পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, লক্ষ তাঁদের এক—দুর্গতদের দুঃখ দূর করা। কিন্তু বিচার বা কাজের প্রণালী এক নয়।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গীর বিশিষ্টতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে গান্ধীজীর সঙ্গে তুলনা করলে। পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালা বাগে একদিন ব্রিটিশ জঙ্গী বিভাগের অত্যাচারের তাণ্ডব লীলা চলেছিল। সেই ঘটনায় দুজন মহাপুরুষই হৃদয়ে বেদনা অনুভব করেছিলেন।—অবশ্য সম্পূর্ণ বিপরীত পথে। দুজনেরই আঘাত তীব্র, দুজনেরই লক্ষের কেন্দ্র এক। কিন্তু বিচারের দৃষ্টিভঙ্গী একেবারে স্বতন্ত্র।

রবীন্দ্রনাথ রাজদরবারের 'স্যর' খেতাব ত্যাগ করে তখনকার ভাইস্‌রয়কে যে চিঠি লেখেন, তাতে চমৎকারভাবে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর স্বকীয়তা ফুটে উঠেছে। তিনি লিখেছিলেন, "পাঞ্জাবের সরকার স্থানীয় গণ্ডগোল দমন করতে গিয়ে যে ভয়াবহ ব্যবস্থার আশ্রয় নিয়েছিলেন, তা রূঢ় আঘাতে আমাদের কাছে প্রকাশ করে দিয়েছে যে, ব্রিটিশের প্রজা হিসাবে ভারতবর্ষে আমাদের কত অসহায় অবস্থা। আমাদের দৃঢ় ধারণা, মানুষগুলোকে যে নির্বিচার, কঠিন সাজা দেওয়া হয়েছিল—এবং যে উপায়ে সেই সাজা প্রয়োগ করা হয়েছিল, সভ্য রাষ্ট্রগুলির ইতিহাসে তার তুলনা দুর্লভ—অবশ্য প্রাচীন ও আধুনিক কয়েকটি জলন্ত দৃষ্টান্ত ছাড়া। এই দুর্ব্যবহার করা হয়েছিল একদল নিরস্ত্র, সামর্থ্যহীন লোকের উপর। আর তা করেছিল এমন এক রাষ্ট্রশক্তি যার আছে লোকসংহারের সব চেয়ে ভয়ংকর সংঘবদ্ধ শক্তি। সেকথা বিচার করলে আমরা এ মন্তব্য না করে থাকতে পারি না যে, ওরকম দুর্ব্যবহার করার কোন রাষ্ট্রনীতিক কারণ ছিল না,—নৈতিক কারণ ত দূরের কথা!

"পাঞ্জাবে আমাদের ভাইদের যে দুর্ভোগ ও অপমান ভোগ

করতে হয়েছে, কঠোরভাবে চেপে রাখা সত্ত্বেও তার বিবরণ ভারতবর্ষের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এর বিরুদ্ধে যে বেদনাহত তীব্র প্রতিবাদ আমাদের জাতির বুক ভরে জেগে উঠেছে, শাসক-সম্প্রদায় তা উপেক্ষা করেছেন। হয়ত-বা তাঁদের ধারণায় যা হিতকর শিক্ষা, সেই শিক্ষা আমাদের দিতে পারায় নিজেরা নিজেদের করেছেন অভিনন্দিত। ইংরেজ-গোষ্ঠী-পরিচালিত ভারতের সংবাদ-পত্রগুলির বেশিরভাগ ত এই হৃদয়হীনতাকে প্রশংসা করেছেন। কোন কোন পত্রিকা আমাদের দুর্গতি নিয়ে তামাশা করার মত অমানুষিকতা করতেও সংকোচ বোধ করেননি। অথচ উৎপীড়িতদের পক্ষাবলম্বী পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত দুঃখের আর্তনাদ বা ন্যায় বিচারের দাবি দমন করতে যে কর্তৃপক্ষ অতি-সজাগ, সেই কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ইংরেজগোষ্ঠীর পত্রগুলি একটুও বাধা পাননি।

"জানি, আমাদের সকল আবেদন নিষ্ফল হয়ে গেছে। আর জানি, যে রাজসরকার তাঁর বাহুশক্তি ও নৈতিক আদর্শধারার উপযুক্ত মহত্ত্ব অতি সহজেই দেখাতে পারতেন, তাঁর মধ্যে আজ প্রতিহিংসা স্পৃহায় রাজনীতিজ্ঞতার উদার দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। এ অবস্থায় আমার দেশের জন্য আমি শুধু যেটুকু করতে পারি, তাই করছি। অত্যাচারের ভয়ে বিহ্বল যাদের মুখ আজ বন্ধ হয়ে আছে, সেই আমার শতসহস্র দেশবাসীর হয়ে আমি প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং এই প্রতিবাদ করার সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করছি।"

১৯২০ সালের ১৪ই জুলাই তারিখে গান্ধীজী তাঁর সম্পাদিত "ইয়ং ইণ্ডিয়া" পত্রিকায় "জেনারেল ডায়ার" প্রবন্ধে একই ঘটনার বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করেন।

তিনি লিখেছিলেন, "আর্মি কাউন্সিল সাব্যস্ত করেছেন, জেনারেল ডায়ারের বোঝবার ভুল হয়েছিল। পরামর্শ দিয়েছেন, ভারতসম্রাটের অধীনে জেনারেল ডায়ারকে আর কোন

চাকরি দেওয়া উচিত হবে না। অবশ্য মন্‌টেগু সাহেব অকুণ্ঠিত-চিত্তে তাঁর ব্যবহারের সমালোচনা করেছেন। তবু যে কারণেই হোক, আমি অনুভব করি, জেনারেল ডায়ারকে কিছুতেই সব চেয়ে দোষী বলা যায় না। তাঁর পাশবিক নিষ্ঠুরতা সুস্পষ্ট। আর্মি কাউন্‌সিলে তিনি যে অদ্ভুতভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করেছেন, তার প্রতি পঙ্‌ক্তিতে তাঁর হীন, অসৈনিকসুলভ ভীরুতা প্রকাশ পেয়েছে। ছুটির দিনে আমোদমত্ত, নিরস্ত্র জনতা আর ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দলকে তিনি বিদ্রোহী সৈন্যদল বলেছেন। একটা ঘেরা জায়গার মধ্যে বন্দী লোকগুলোকে যে খরগোসের মত গুলি করে মারতে পেরেছিলেন, সেই কাজের জন্য তিনি নিজেকে পাঞ্জাব প্রদেশের ত্রাণকর্তা বলে মনে করেছেন। এরকম লোক সৈনিক নামের অযোগ্য। তাঁর এই আচরণে বীরত্বের পরিচয় নেই। তাঁকে কোন বিপদের ঝুঁকি নিতে হয় নি। তিনি কোন বিরুদ্ধতা না পেয়েই গুলি চালিয়েছিলেন এবং শত্রুদলকে আগে থেকে সাবধানও করে দেননি। একে 'বোঝার ভুল' বলা ঠিক হবে না। বরং তিনি বিপদের কল্পনা করে যা কিছু করেছেন, তা সম্পূর্ণ উলটো কাজ। এর মধ্যে আছে হৃদয়হীনতা এবং মারাত্মক অযোগ্যতা।***"

মহাকবির চিত্তে যা আঘাত করেছে প্রধানতঃ বুদ্ধির রাজ্যে, মহাত্মাজীর মনে তা-ই আঘাত করেছে হৃদয়ের রাজ্যে। রবীন্দ্রনাথের ভাষা ক্ষোভের ভাষা। গান্ধীজীর দরদের। মহাকবির বিচারপদ্ধতি যুক্তিপ্রধান। লোকগুরুর আবেগপ্রধান। একজন সবচেয়ে অনুভব করেছেন উৎপীড়কের বিরুদ্ধে মর্মবেদনা। আর একজনের বেদনা মর্মান্তিক হয়ে উঠেছে উৎপীড়িতের প্রতি মমতায়।

একজনের দৃষ্টিভঙ্গী মূলতঃ ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল, আর একজনের নৈতিক (moral)। অবশ্য, মহাত্মাজীর রচনার প্রতি ছত্রেও আছে যুক্তির প্রেরণা। বলা বাহুল্য, মহাত্মাজীর মনে চিন্তার প্রণালী খুব

সুশৃঙ্খল, তাতে এলোমেলো ভাবালুতা নেই। কিন্তু তাঁর অন্তরে যে মানুষটি বিচার করেন, তিনি ঠিক বুদ্ধিপ্রবণ (intellectual) নন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী মূলতঃ যদি হয় হিব্রুজাতির, তাহলে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গীকে বলা যেতে পারে গ্রীকজাতির মত।

এ রকম ক্ষেত্রে কে বড় কে ছোট—সে প্রশ্ন অবান্তর। বিভিন্ন মতের মানুষ নিয়ে গড়ে উঠেছে লোকসমাজ। সমাজে যদি আলাদা আলাদা রুচি এবং দৃষ্টিভঙ্গী না থাকত, তাহলে সব মানুষ হত কমবেশী একের নকল। পৃথিবীতে শুধু পদ্ম থাকত, কিংবা গোলাপ। পদ্ম আর গোলাপ একসঙ্গে পাশাপাশি থাকত না। সংসার থেকে লোপ পেত বিচিত্রতা।

অনেক সময় আমরা মহাপুরুষদের পরস্পরের সঙ্গে তুলনা করে বলি, ইনি যদি এরকম না হয়ে ওঁর মত হতেন! কিন্তু ভক্তির বিহ্বলতায় ভুলে যাই যে, রবীন্দ্রনাথের যদি থাকত গান্ধীজীর মন, এবং গান্ধীজী যদি জন্মাতেন রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে, তাহলে এইমাত্র ঘটত যে, রবীন্দ্রনাথ হতেন গান্ধী এবং গান্ধী হতেন রবীন্দ্রনাথ। অর্থাৎ এক হতেন আর-এক এবং আর-এক হতেন এক। তার ফলে বিশ্বজনীন-রঙ্গভূমিতে নিশ্চয়ই ঘটত না নতুন কিছু বৈচিত্র্যের সম্ভাবনা।

*

*   *

রবীন্দ্রনাথের মন বুদ্ধিপ্রধান বটে, কিন্তু বুদ্ধিসর্ব্বস্ব নয়। যুক্তিবাদী হয়েও তিনি জীবনকে গ্রহণ করেন নি কূট দার্শনিকের মত। কারণ তাঁর চিত্তলোকের মহাকেন্দ্রে আর একটি বিপরীত সত্তা আছে। তার প্রভাবে তিনি হয়ে উঠেছেন মরমী, 'সুদূরের পিয়াসী'।

অতীন্দ্রিয়তা রবীন্দ্র-মহাসত্তার সবচেয়ে পরম সম্পদ। তিনি অপরিমেয় অতীন্দ্রিয়তা নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছেন। "জীবন স্মৃতি"তে

নিজেই স্বীকার করেছেন, তাঁর ছেলেবেলাতে জগৎসংসার তাঁর কাছে ছিল চরম রহস্যে ভরা। চারপাশে যা কিছু দেখতেন, তাতে তাঁর মন ভরত না। তিনি সবকিছুর পিছনে অনুভব করতেন এক অজানার অস্তিত্ব। তা ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না। তা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। তাঁর বোধ হত, বস্তুলোকের ভিতরে আছে যেন বাস্তবাতীতের অলকাপুরী।

ক্রমে শৈশব এগিয়ে এল যৌবনে। তাঁর কল্পনা ও অনুভূতি হল সুবিকশিত। তাঁর মনের গোপন কোণে অতীন্দ্রিয় বোধ জেগে উঠল গভীরতর হয়ে। তিনি অনুভব করলেন, শুধু বাইরের জগতের অন্তরালে পরমাশ্চর্য নেই, পরমাশ্চর্য আছে তাঁর নিজের ভিতরেও। নিজেকে নিয়ে তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইল না। সে বিস্ময়বোধ প্রকাশ পেল তাঁর কবিতায়, প্রস্ফুট হয়ে উঠল তাঁর জীবনচর্যায়।

রবীন্দ্রনাথ "বঙ্গভাষার লেখক" বইখানিতে প্রথম আত্মজীবনী-মূলক প্রবন্ধ লেখেন। সে অনেকদিন আগেকার কথা। তখনও তিনি নোবেল পুরস্কার পান নি। সেই প্রবন্ধে তিনি নিজের সম্বন্ধে অতীন্দ্রিয় অনুভূতির কথা প্র াশ করেন।

তিনি আপন বিশ্বাসটিকে ব্যাখ্যা করে লেখেনঃ "কাব্যরচনা সম্বন্ধেও সেই বিশ্ববিধানই দেখিতে পাই, অন্ততঃ আমার নিজের মধ্যে তাহা উপলব্ধি করিয়াছি। যখন যেটা লিখিতেছিলাম, তখন সেইটাকেই পরিণাম বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। এইজন্য সেইটুকু সমাধা করার কাজেই অনেক যত্ন ও অনেক আনন্দ আকর্ষণ করিয়াছি। আমিই যে তাহা লিখিতেছি এবং একটা কোন বিশেষ ভাব অবলম্বন করিয়া লিখিতেছি, এ সম্বন্ধেও সন্দেহ ঘটে নাই। কিন্তু আজ জানিয়াছি, সে সকল লেখা উপলক্ষ মাত্র, তাহারা যে অনাগতকে গড়িয়া তুলিতেছে, সেই অনাগতকে তাহারা চেনেও না। তাহাদের রচয়িতার মধ্যে আর

একজন কে রচনাকারী আছেন, যাঁহার সম্মুখে সেই ভাবী তাৎপর্য প্রত্যক্ষ বর্তমান।

"ফুৎকার বাঁশির একএকটা ছিদ্রের মধ্য দিয়া একএকটা সুর জাগাইয়া তুলিতেছে এবং নিজের কর্তৃত্ব উচ্চৈঃস্বরে প্রচার করিতেছে, কিন্তু কে সেই বিচ্ছিন্ন সুরগুলিকে রাগিণীতে বাঁধিয়া তুলিতেছে? ফুঁ সুর জাগাইতেছে বটে, কিন্তু ফুঁ ত বাঁশি বাজাইতেছে না। সেই বাঁশি যে বাজাইতেছে, তাহার কাছে সমস্ত রাগরাগিণী বর্তমান আছে, তাহার অগোচরে কিছুই নাই :

"বলিতেছিলাম বসি একধারে
আপনার কথা আপন জনারে,
শুনাতেছিলাম ঘরের দুয়ারে
ঘরের কাহিনী যত ;
তুমি সে ভাষারে দহিয়া অনলে,
ডুবায়ে ভাসায়ে নয়নের জলে
নবীন প্রতিমা নবকৌশলে
গড়িলে মনের মত।

"এই শ্লোকটার মানে বোধ করি এই যে, যেটা লিখিতে যাইতেছিলাম, সেটা সাদা কথা, সেটা বেশী কিছু নহে। কিন্তু সেই সোজা কথা, সেই আমার নিজের কথার মধ্যে এমন একটা সুর আসিয়া পড়ে, যাহাতে তাহা বড় হইয়া ওঠে, ব্যক্তিগত না হইয়া বিশ্বের হইয়া ওঠে। সেই যে সুরটা, সেটা ত আমার অভিপ্রায়ের মধ্যে ছিল না। আমার পটে একটা ছবি দাগিয়াছিলাম বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে যে একটা রঙ ফলিয়া উঠিল, সেই রঙ ও সে রঙের তুলি ত আমার হাতে ছিল না :

"নূতন ছন্দ অন্ধের প্রায়
ভরা আনন্দে ছুটে চলে যায়,
নূতন বেদনা বেজে ওঠে তায়
নূতন রাগিণী ভরে।

যে কথা ভাবিনি বলি সেই কথা,
যে ব্যথা বুঝি না জাগে সেই ব্যথা,
জানি না এনেছি কাহার বারতা
কারে শুনাবার তরে!

"* * * শুধু কি কবিতালেখার একজন কর্তা কবিকে অতিক্রম করিয়া তাঁহার লেখনী চালনা করিয়াছেন? তাহা নহে। সেই সঙ্গে ইহাও দেখিয়াছি যে, জীবনটা যে গঠিত হইয়া উঠিতেছে, তাহার সমস্ত যোগবিয়োগের বিচ্ছিন্নতাকে কে একজন একটি অখণ্ড তাৎপর্যের মধ্যে গাঁথিয়া তুলিতেছেন। সকল সময়ে আমি তাঁহার আনুকূল্য করিতেছি কি না, জানি না! কিন্তু আমার সমস্ত বাধাবিপত্তিকেও, আমার সমস্ত ভাঙাচোরাকেও তিনি নিয়তই গাঁথিয়া জুড়িয়া দাঁড় করাইতেছেন। কেবল তাই নয়, আমার স্বার্থ,—আমার প্রবৃত্তি আমার জীবনকে যে অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতেছে, তিনি বারে বারে সে সীমা ছিন্ন করিয়া দিতেছেন। তিনি সুগভীর বেদনার দ্বারা, বিচ্ছেদের দ্বারা বিপুলের সহিত বিরাটের সহিত তাহাকে যুক্ত করিয়া দিতেছেন। সে যখন একদিন হাট করিতে বাহির হইয়াছিল, তখন বিশ্বমানবের মধ্যে সে আপনার সফলতা চায় নাই। সে আপনার ঘরের সুখ, ঘরের সম্পদের জন্যই কড়ি সংগ্রহ করিয়াছিল। কিন্তু সেই মেঠো পথ, সেই ঘোরো সুখদুঃখের দিক হইতে সে তাহাকে জোর করিয়া পাহাড়-পর্বত-অধিত্যকা-উপত্যকার দুর্গমতার মধ্য দিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে:

"এ কি কৌতুক নিত্য নূতন
ওগো কৌতুকময়ী।
যেদিকে পান্থ চাহে চলিবারে
চলিতে দিতেছ কই?

গ্রামের যে পথ ধায় গৃহপানে,
চাষীগণ ফিরে দিবা-অবসানে,
গোঠে ধায় গরু, বধূ জল আনে
শতবার যাতায়াতে,

একদা প্রথম প্রভাত বেলায়
সে পথে বাহির হইনু হেলায়,
মনে ছিল, দিন কাজে ও খেলায়
কাটায়ে ফিরিব রাতে।

পদে পদে তুমি ভুলাইলে দিক,
কোথা যাব আজি নাহি পাই ঠিক,
ক্লান্ত হৃদয়, ভ্রান্ত পথিক
এসেছি নূতন দেশে।

কখনো উদার গিরির শিখরে
কভু বেদনার তমোগহ্বরে
চিনি না যে পথ সে পথের পরে
চলেছি পাগল বেশে।

"*** তত্ত্ববিদ্যায় আমার কোন অধিকার নাই। দ্বৈতবাদ অদ্বৈতবাদের কোন তর্ক উঠিলে আমি নিরুত্তর হইয়া থাকিব। আমি কেবল অনুভবের দিক দিয়া বলিতেছি, আমার মধ্যে আমার অন্তর্দেবতার একটি প্রকাশের আনন্দ রহিয়াছে। সেই আনন্দ, সেই প্রেম আমার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, আমার বুদ্ধিমন, আমার নিকট প্রত্যক্ষ এই বিশ্বজগত, আমার অনাদিঅতীত ও অনন্তভবিষ্যৎ পরিপ্লুত করিয়া আছে। এ লীলা ত আমি কিছুই বুঝি না, কিন্তু আমার মধ্যেই নিয়ত এই এক প্রেমের লীলা। *** আমি কি আত্মার মধ্যে, কি বিশ্বের মধ্যে বিস্ময়ের অন্ত দেখি না। আমি জড় নাম দিয়া, সসীম নাম দিয়া কোন জিনিসকে একপাশে ঠেলিয়া

রাখিতে পারি নাই। এই সীমার মধ্যেই এই প্রত্যক্ষের মধ্যেই অনন্তের যে প্রকাশ, তাহাই আমার কাছে অসীম বিস্ময়াবহ।***

"বাহির হইতে দেখো না এমন করে
আমায় দেখো না বাহিরে
আমায় পাবে না আমার দুখে ও সুখে,
আমার বেদনা খুঁজো না আমার বুকে,
আমায় দেখিতে পাবে না আমার মুখে,
কবিরে খুঁজিছ যেথায় সেথা সে নাহিরে।
যে-আমি স্বপন-মুরতি গোপনচারী,
যে-আমি আমারে বুঝিতে বুঝাতে নারি,
আপন গানের কাছেতে আপনি হারি,
সেই আমি কবি, কে পারে আমারে ধরিতে?
মানুষ আকারে বদ্ধ যে জন ঘরে,
ভূমিতে লুটায় প্রতি নিমেষের তরে,
যাহারে কাঁপায় স্তুতিনিন্দার জ্বরে,
কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে।" ১

সেদিন মহাকবির এই আত্মকথা অনেকের ভাল লাগেনি। কোন কোন সাহিত্যবিচারক ত অবজ্ঞা: হাসি হেসেছিলেন। তাঁদের

১ শেষ বয়সের একখানি চিঠিতে তিনি নিজের বিশ্বাসটিকে আরও স্পষ্ট করেই প্রকাশ করেছেন: "নিজেকে বিশেষ কোন একজন মনে করতে আজও পারিনে। এ সম্বন্ধে আমার স্বদেশের অনেক লোকের সঙ্গেই আমার মতের মিল হয়। আমার অন্তর-লোকে কোন একটা অগমস্থানে একজন কেউ বাস করে, —সে কোথা থেকে কথা কয়, —সে কথার মূল্যও আছে কিন্তু আমিই যে সে, তা ভাবতেও পারিনে। আমার মধ্যে তার বাসা আছে এই পর্যন্ত। যে-আমি প্রত্যক্ষ গোচর, সে নিতান্তই বাজে লোক। তাকে সহ্য করা শক্ত, বন্দনা করা দূরের কথা। তাকে কোন রকম করে তফাতে সরিয়ে দিতে পারলে তবেই আমার অন্তরতম মানুষটির মানরক্ষা হয়।"

বস্তুবাদী মনে সাহিত্যের মিসটিসিজ্‌ম সম্বন্ধে বিশেষ ধারণা ছিল না। কেউ কেউ ত ব্যঙ্গ কবিতা লিখে মহাকবিকে সস্তার বিদ্রূপ করতেও দ্বিধা করেননি। তবু তিনি ছিলেন আপন বিশ্বাসে অটল। নিজের মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করার পরম সন্ধান ত্যাগ করেননি।

ক্রমে এই জীবন-সন্ধান পরিণত হল জীবন-সাধনায়। রবীন্দ্রনাথ একান্ত ভাবেই মজলেন। তিনি অরূপকে লাভ করার আশায় রূপ-সাগরে ডুব দিলেন। তাঁর জীবনে ঘনিয়ে উঠল অফুরানের অভিসার। 'যে জন দেয় না দেখা, যায় না দেখে, ভালবাসে আড়াল থেকে'— সেই গভীরের গোপন ভালবাসায় তাঁর মন বাঁধা পড়ল।

মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের মত মরমী মহাশিল্পীর আবির্ভাব বিশ্ব-সাহিত্যে আর কখন ঘটেছে কিনা, সন্দেহ।

*

* *

ভগবানের অস্তিত্বে রবীন্দ্রনাথ দৃঢ়বিশ্বাসী। জীবনে তিনি উপলব্ধি করেছেন, এই জীবজগৎ, বিশ্বসংসার সেই পরম সত্তার লীলাভূমি। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, ঘরোয়া জীবনে তিনি সাধারণতঃ এই বিশ্বাস সম্বন্ধে চুপ করেই থাকেন।

শুনেছি, লোকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে গেলে শুধু ভগবদ্-কথাই শুনতে পেতেন। স্বামী বিবেকানন্দের কাছে গেলেও প্রধানতঃ ভগবদ্-কথারই আলোচনা হত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে গেলে সাধারণতঃ তেমনটি হয় না।

আমি শান্তিনিকেতন আশ্রমে ছিলুম প্রায় দুবছর। সে সময়ে সাক্ষাতে কোনদিন তাঁকে ঈশ্বরকথা আলোচনা করতে শুনিনি। অবশ্য তিনি যীশুখ্রীষ্টের জন্মোৎসব এবং অপরাপর দু-একটি উৎসব উপলক্ষে শান্তিনিকেতন মন্দিরে ভাষণ দিয়েছিলেন। সে ভাষণ মূলতঃ ধর্মকথা, সন্দেহ নেই। কিন্তু তার সুর ছিল নিতান্ত

মামুলী। তা শুনে মনে হত, রবীন্দ্রনাথ যেন ভাষা দিয়ে শ্রোতাদের অভিভূত করার চেষ্টা করছেন, প্রাণ দিয়ে প্রাণ স্পর্শ করতে পারছেন না।

তাঁকে নতুনভাবে পেয়েছিলুম—কেবল একদিন। সেদিনের কথা এখনও ভুলতে পারিনি।

শান্তিনিকেতনে ছাত্রছাত্রীদের দিনের কাজ শুরু হয় ভগবদ্-প্রার্থনা দিয়ে। ভোরবেলা গ্রন্থাগার ভবনের সামনে ছাত্রছাত্রীরা এসে সারি বেঁধে দাঁড়ান। অধ্যাপক ও দপ্তরের অপরাপর কর্মীরাও আসেন। তারপর নির্বাচিত কয়েকজন ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপক ভক্তিমূলক রবীন্দ্রসংগীত করেন।

যে সময়ের কথা বলছি, তখন একসঙ্গে অনেকগুলি নতুন অধ্যাপক কাজে যোগ দিয়েছিলেন। লক্ষ করলুম, তাঁরা বড় একটা প্রার্থনা সভায় আসেন না। হঠাৎ পুরাতন অধ্যাপকদের সংখ্যাও কমতে লাগল। কথাটা বিশ্বভারতীর কর্মসচিব রথীন্দ্রনাথের কানে উঠেছিল। একদিন তিনি স্বয়ং প্রার্থনাসভায় এসে যোগ দিলেন। দেখতে পেলেন, অধ্যাপকেরা অনেকেই অনুপস্থিত।

সেদিন বিকালবেলা মহাকবি অধ্যাপকদের সভা ডাকলেন। কোণার্কের সামনে চাতালে সভা বসল। রবীন্দ্রনাথ বেশ ক্ষোভের সঙ্গে সকালবেলার কথা উল্লেখ করলেন। তারপর বারবার বলতে লাগলেন, আমরা হয়ত কেউ বিশ্বাস করি, কেউ করি না। কিন্তু যে ছেলেমেয়ের দল আশ্রমে মানুষ হচ্ছে, তাদের মনে গোড়া থেকে একটা অবিশ্বাস জাগিয়ে তোলা কখনই আমাদের উচিত হবে না। তাদের জীবনে আছে নানা সম্ভাবনা। ভবিষ্যতে তাদের এগিয়ে যাবার পথে নানা বাধা আসবে, দুঃখ আসবে। বিশ্বাসের জোরে মানুষ এমনি দিনে পেয়েছে বল, পেয়েছে পথ, পেয়েছে নিজের উপর নূতনতর আস্থা। সেই সম্ভাবনা থেকে আমাদের আশ্রমের ছেলে-মেয়েদের বঞ্চিত করা তোমাদের কিছুতেই উচিত হবে না।

মনে আছে, সেদিন তিনি অনেক কথা বলেননি। পরম সত্তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে যুক্তির অবতারণাও করেননি। কয়েকটি সাদা কথায় ভরা ছিল তাঁর বক্তব্য : ওগো আধুনিক অধ্যাপকের দল, তোমরা নিজেরা বিশ্বাস কর, আর নাই কর, তবু প্রার্থনায় যোগ দিও। ছেলেমেয়েদের জীবনে প্রার্থনা করার অভ্যাস যাতে গড়ে ওঠে, তার জন্য অন্ততঃ প্রার্থনা সভায় উপস্থিত থেক।

সেদিন মহাকবির ভাষণে বারবার পুনরউক্তি দোষ ঘটছিল। বলা দাঁড়িয়েছিল প্রায় বকায়। তবু তাঁর সেই বলা কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারিনি। তা আমার মনে জাগিয়েছিল এক অজানা সাড়া। মহাকবির কথায় ছিল যে তাঁর অন্তরের অনুভূতির নিবিড় স্পর্শ।

*

* *

তাঁর মত ভগবদ্‌বিশ্বাসী মহাসাধকের সহজ পরিণতি ঘটে সাধারণতঃ ধর্ম্মপ্রচাকরূপে। তিনি কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধর্মপ্রচারক হ'তে পারেননি। হয়ত কখন হ'তে চাননিও। তাঁর আপন ধর্মমত সম্বন্ধে আলোচনা আছে ইংরেজী হিবার্ট বক্তৃতামালায়। সেখানে তিনি কতকটা দার্শনিকের মত যুক্তির পথে জীবনবোধের বিশ্লেষণ করেছেন, বিচার করেছেন। আবার "মানুষের ধর্ম" বইখানিতে তা প্রকাশ করেছেন শিল্পসাধকের মত। তিনি যে জীবনে একাধিকবার পরম সত্তার অনুভূতি লাভ করেছিলেন, তাও বর্ণনা করেছেন।

তিনি লিখেছেন : "আমার জন্ম যে পরিবারে সে-পরিবারের ধর্মসাধনা একটি বিশেষভাবের। উপনিষদ্ এবং পিতৃদেবের অভিজ্ঞতা, রামমোহন এবং আর আর সাধকদের সাধনাই আমাদের পারিবারিক সাধনা। আমি পিতার কনিষ্ঠপুত্র। জাতকর্ম থেকে আরম্ভ করে আমার সব সংস্কারই বৈদিকমন্ত্র দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছিল,

অবশ্য ব্রাহ্মমতের সঙ্গে মিলিয়ে। আমি স্কুল-পালানো ছেলে। যেখানেই গণ্ডি দেওয়া হয়েছে, সেখানে আমি বনিবনা করতে পারিনি কখনও। যে-অভ্যাস বাইরে থেকে চাপানো, সে আমি গ্রহণ করতে অক্ষম। কিন্তু পিতৃদেব সে জন্যে কখনও ভর্ৎসনা করতেন না। তিনি নিজেই স্বাধীনতা অবলম্বন করে পৈতামহিক সংস্কার ত্যাগ করেছিলেন। গভীরতর জীবনতত্ত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করার স্বাধীনতা আমারও ছিল।* * *

"বাল্যে উপনিষদের অনেক অংশ বারবার আবৃত্তি দ্বারা আমার কণ্ঠস্থ ছিল। সব কিছু গ্রহণ করতে পারিনি সকল মন দিয়ে। শ্রদ্ধা ছিল, শক্তি ছিল না হয়ত। এমন সময় উপনয়ন হল। উপনয়নের সময় গায়ত্রী মন্ত্র দেওয়া হয়েছিল। কেবলমাত্র মুখস্থভাবে না। বারংবার সুস্পষ্ট উচ্চারণ করে আবৃত্তি করেছি এবং পিতার কাছে গায়ত্রীমন্ত্রের ধ্যানের অর্থ পেয়েছি। তখন আমার বয়স বার বৎসর হবে। এই মন্ত্র চিন্তা করতে করতে মনে হত বিশ্বভুবনের অস্তিত্ব আর আমার অস্তিত্ব একাত্মক। ভূ র্ভুবঃ স্বঃ—এই ভূলোক অন্তরীক্ষ, আমি তারি সঙ্গে অখণ্ড। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি অন্তে যিনি আছেন, তিনিই আমাদের মনে চৈতন্য প্রেরণ করছেন। চৈতন্য ও বিশ্ব, বাহিরে ও অন্তরে সৃষ্টির এই দুই ধারা এক ধারায় মিলছে।

"এমনি করে ধ্যানের দ্বারা যাকে উপলব্ধি করেছি, তিনি বিশ্বাত্মাতে আমার আত্মাতে চৈতন্যের যোগে যুক্ত। এই রকম চিন্তার আনন্দে আমার মনের মধ্যে একটা জ্যোতি এনে দিলে। এ আমার সুস্পষ্ট মনে আছে। যখন বয়স হয়েছে, হয়ত আঠার বা উনিশ হবে বা বিশও হতে পারে, তখন চৌরঙ্গীতে ছিলুম দাদার সঙ্গে।*** ভোরে উঠে একদিন চৌরঙ্গীর বাসার বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলুম। তখন ওখানে ফ্রী স্কুল বলে একটা স্কুল ছিল।

"রাস্তাটা পেরিয়েই স্কুলের হাতাটা দেখা যেত, সেদিকে চেয়ে দেখলুম, গাছের আড়ালে সূর্য উঠছে। যেমনি সূর্যের আবির্ভাব

হল গাছের অন্তরাল থেকে, অমনি মনের পরদা খুলে গেল। মনে হল, মানুষ আজন্ম একটা আবরণ নিয়ে থাকে। সেটাতেই তার স্বাতন্ত্র্য। স্বাতন্ত্র্যের বেড়া লুপ্ত হলে সাংসারিক প্রয়োজনের অনেক অসুবিধা। কিন্তু সেদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার আবরণ খসে পড়ল। মনে হল, সত্যকে মুক্ত দৃষ্টিতে দেখলুম। মানুষের অন্তরাত্মাকে দেখলুম। দু-জন মুটে কাঁধে হাত দিয়ে হাসতে হাসতে চলছে। তাদের দেখে মনে হল, কী অনির্বচনীয় সুন্দর। মনে হলনা, তারা মুটে। সেদিন তাদের অন্তরাত্মাকে দেখলুম, যেখানে আছে চিরকালের মানুষ।***এই আমার জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা যাকে আধ্যাত্মিক নাম দেওয়া যেতে পারে।"

রবীন্দ্রনাথ পরিণত জীবনেও লাভ করেছিলেন এমনি পরমের অনুভূতি। তিনি পুনরায় লিখেছেন ঃ "বর্ষার সময় খালটা থাকত জলে পূর্ণ। ** শুকনোর দিনে লোকে চলত তার উপর দিয়ে। এপারে ছিল একটা হাট, সেখানে বিচিত্র জনতা। দোতলার ঘর থেকে লোকালয়ের লীলা দেখতে দেখতে ভাল লাগত। পদ্মায় আমার জীবনযাত্রা ছিল জনতা থেকে দূরে। নদীর চর ধু-ধু বালি, স্থানে স্থানে জলকুণ্ড ঘিরে জলচর পাখি।***সেই সময়কার একদিনের কথা মনে আছে। ছোট, শুকনো, পুরানো খালে জল এসেছে। পাঁকের মধ্যে ডিঙিগুলো ছিল অর্ধেক ডোবানো, জল আসতে তাদের ভাসিয়ে তোলা হল। ছেলেগুলো নতুন জলধারার ডাক শুনে মেতে উঠেছে। তারা দিনের মধ্যে দশবার করে ঝাঁপিয়ে পড়ছে জলে।

"দোতলার জানালায় দাঁড়িয়ে সেদিন দেখছিলুম, সামনের আকাশে নববর্ষার জলভারনত মেঘ, নীচে ছেলেদের মধ্যে দিয়ে প্রাণের তরঙ্গিত কল্লোল। আমার মন সহসা আপন খোলা দুয়ার দিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে—সুদূরে। অত্যন্ত নিবিড়ভাবে আমার অন্তরে একটা অনুভূতি এল, সামনে দেখতে পেলুম নিত্যকালব্যাপী একটি সর্বানুভূতির অনবচ্ছিন্ন ধারা, নানা প্রাণের বিচিত্র লীলাকে

মিলিয়ে নিয়ে একটি অখণ্ড লীলা। নিজের জীবনে যা বোধ করছি, যা ভোগ করছি, চারদিকে ঘরে ঘরে জনে জনে মুহূর্তে মুহূর্তে যা-কিছু উপলব্ধি চলছে, সমস্ত এক হয়েছে একটি বিরাট অভিজ্ঞতার মধ্যে।***

"একটা মুক্তির আনন্দ পেলুম। স্নানের ঘরে যাবার পথে একবার জানালার কাছে দাঁড়িয়েছিলুম ক্ষণকাল অবসর যাপনের কৌতুকে। সেই ক্ষণকাল এক মুহূর্তে আমার সামনে বৃহৎ হয়ে উঠল। চোখ দিয়ে জল পড়ছে তখন, ইচ্ছে করছে সম্পূর্ণ আত্ম-নিবেদন করে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করি কাউকে।***"

রবীন্দ্রনাথ এইভাবে অকস্মাতের বিদ্যুৎস্পর্শে বারবার চরম আধ্যাত্মিক অনুভূতির অধিকারী হয়েছেন। তবু তিনি প্রচলিত অধ্যাত্ম সাধনায় চরমভাবে মেতে উঠতে পারেননি। এর কারণ হল তাঁর মরমী (mystic) খণ্ড-সত্তার আচ্ছাদনে কোনদিন তাঁর সমগ্র সত্তা লুপ্ত হয়নি। ধর্মসাধকদের মত অতীন্দ্রিয় অনুভূতির তাপে কোনদিন পুড়ে ছারখার হয়ে যায়নি তাঁর বাস্তবজীবন।

বরং, মরমী খণ্ড-সত্তার পাশে তাঁর চরম শক্তিমান শিল্পীসত্তা জীবনতৃষ্ণা এবং ভোগানন্দের পরিপূর্ণ আবেগ নিয়ে বরাবর বিরাজ করছে। তাই তাঁর মানসলোকে অ শ্রয় পেয়েছে ভোগের সাধনার পাশে ভোগাতীতের আরাধনা। এক মূলে প্রখর যুক্তি, প্রচণ্ড হৃদয়াবেগ এবং পরম অতীন্দ্রিয়তা আপন আপন স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে বিকশিত হয়ে ওঠার ফলে তাঁর মহাসত্তার রূপটি হয়েছে জটিলতম। এক হয়েছে বহু। তিনি যেন বিশ্বমানবের মানসলোকের অরণ্যে বিশাল পঞ্চবটী।

এযুগে রবীন্দ্রনাথের মত এত বড় কমপ্লেক্স চরিত্র আর কোথাও আছে কিনা, জানিনা। প্রাচীন গ্রীস বা রোমের ইতিহাসে হয়ত তাঁর তুলনা মিলতে পারে। আমরা সচরাচর তাঁকে বলি মহাপুরুষ। মহাপুরুষ তিনি, সন্দেহ নেই। কিন্তু তার চেয়েও খাঁটি কথা হচ্ছে,

তিনি অনেকগুলি মহাপুরুষের মিলিত এক সত্তা। তিনি বিংশ শতাব্দীর বিরাট পুরুষ।

সাধারণতঃ দেখা যায়, বিপরীত খণ্ডসত্তাগুলির বিষম দ্বন্দ্ব মানুষের চরিত্রে সৃষ্টি করে দুর্নিবার অসংগতি। রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব হচ্ছে, নিজের অন্তর্লোকে তিনি সেরকম অসংগতি ঘটতে দেননি। প্রচণ্ড শক্তিশালী আধার না হলে এই অসংগতির টানাহেঁচড়ায় তাঁকে পাগল হয়ে যেতে হত। শোনা যায়, তাঁর দুই ভাই এমনিধারা পাগল ছিলেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিরলস সাধনার দ্বারা নিজের খণ্ডসত্তার মালাকে সমুদ্গত করতে পেরেছেন। যা স্থূল, তা হয়েছে সূক্ষ্ম। তার ফলে তাঁর মানস-সরোবরে সৃষ্টি হয়েছে বিপরীতের মিলনে এক অপরূপ সংগতি। সে সংগতি মহাশক্তির উৎস। একটা দৃষ্টান্ত দিই। কিছু আগে আমরা তাঁর হৃদয়ে ভোগ ও ত্যাগের চিরন্তন দ্বন্দ্বের কথা আলোচনা করেছি। সেই দ্বন্দ্ব তাঁর শিল্পজীবনে ঘটিয়েছে অঘটন। তিনি নেতিমূলক বৈরাগ্যের বদলে ভারতবাসীকে শুনিয়েছেন এক নতুন বৈরাগ্যের বাণী। "নৈবেদ্যে"র বহু-পরিচিত একটি সনেটে আছে ঃ

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারংবার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানা বর্ণগন্ধময়। প্রদীপের মত
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়

তোমার মন্দির মাঝে। ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।
যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।"

মহাবাউলের এই জীবনতত্ত্বে ত্যাগ ও ভোগ মিলিত হয়েছে পরম ঐক্যে। তাঁর কাছে ভোগ সাধারণ মানুষের ভোগ নয়। ত্যাগের পথে যে ভোগ, সেই ভোগই তাঁর কাম্য। 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা।'

আবার নিরাসক্তির সাধনা মানে কৃত্রিম কৃচ্ছ্রসাধনা নয়। তাঁর কাছে ত্যাগ বাইরের বস্তু নয়,—অন্তরের অনুভূতি। তিনি মানবজীবনের কোনদিককেই বর্জন করতে চান না। জীবনকে সর্বাত্মকভাবে গ্রহণের দ্বারা পরিপূর্ণ করে তোলাই তাঁর আজন্মের সাধনা। বিচিত্রকে আস্বাদনের মধ্যে দিয়েই চলে তাঁর আসক্তি-মোচনের তপস্যা।

এই জীবন-বাণী ফল্গুধারার মত তাঁর কাব্যসাধনার মূলেও রস জুগিয়েছে। নিরাসক্তির মন্ত্র পৃথিবীতে কিছু নতুন নয়। যুগে যুগে ধর্মাত্মা মহামানুষেরা এ বাণী মানুষকে শুনিয়েছেন। আবার সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় পথে জীবনের পরিপূর্ণ আনন্দধারা ভোগ কর—এ আদর্শও আমাদের অজানা নয়। দেশে দেশে শ্রেষ্ঠ কবিদের রচনায় তা রূপায়িত হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বাণীর মধ্যে ঘটেছে এ দুয়ের মিলনের অপূর্ব সুসংগতি।

হয়ত তাঁর এই জীবনতত্ত্বের মধ্যে মুসলমান সংস্কৃতির ভোগ ব্যাকুলতা, বৌদ্ধ সংস্কৃতির জীবপ্রেম আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতির জীবনতৃষ্ণা এবং হিন্দুসংস্কৃতির ভগবদ্‌ভক্তি ও নিরাসক্তি এসে এক হয়ে গেছে। মানবহৃদয়ের অসীম ও সসীমের প্রতি চিরন্তন তৃষ্ণা

মূর্ত হয়ে উঠেছে একটি পরম বহুমুখী আকাঙ্ক্ষায়। রূপকের ভাষায় বলা যায়, যেন রাত্রি এসে মিশেছে দিনের পারাবারে। মানবসভ্যতার মধ্যে আছে যে দুটি বিপরীত আদি জিজ্ঞাসা, তাদের বিরোধ দূর হয়ে গেছে একটি অপরূপ সুনিবিড় বিশ্ববোধের অনুভূতিতে।

*

* *

আগেই ইঙ্গিতে জানিয়েছি, শুধু জীবনবাণীতে নয়, রবীন্দ্রকাব্যেও আছে এই বিপরীত শক্তি-সমাবেশের পরম বিকাশের পরিচয়।

কবিহিসাবেও তিনি হচ্ছেন বিচিত্রধর্মী। তাঁর অন্তরের বহুমুখী সৃষ্টিপ্রেরণাকে জোর করে একমুখী করার চিহ্ন কোথাও নেই। যদি তিনি তা করতেন, তাহলে তাঁর বিরাট কাব্যরচনাবলী নিরস একঘেয়েমিতে ভরে যেত। তা হয়ে উঠত শুধু এক পাল শুষ্ক দোঁহা অথবা পবিত্র ভজন। তার মধ্যে থাকত না 'নিত্যনব' উল্লাসের উৎস।

জানি, কাব্যজগতে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠসৃষ্টি নিয়ে মতভেদ আছে। তবু বলব, বিশ্বসংস্কৃতির ইতিহাসে প্রকৃতিমূলক লিরিকই তাঁর চরম দান। এদের তুলনা মেলা ভার।

কিন্তু এই গীতিকবিতাগুলির মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায় নানা জাত। মূল ভাব এবং প্রেরণা দুদিক থেকেই। সময়ে সময়ে তাদের অমিল এত সুস্পষ্ট যে বোধ হয়, তারা যেন রূপরসে একেবারে বিপরীত। মনে সন্দেহ জাগে, এ কি একজনের সৃষ্টি?

একটা দৃষ্টান্ত দিই! বাদল সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকারে দিন শেষ হল। বৃষ্টিধারা অবিরাম ঝরে চলেছে। ঘন কাল আকাশে বাজছে গুরুগুরু মেঘের ডমরু। বনের তিমির আড়ালে বারিপাতের একটানা ঝরঝরানি সুর। সেই সুরে রবীন্দ্রনাথের মন উঠল ভরে। কবি-কল্পনার প্রেরণা পরিণত হল দুর্লভ অধ্যাত্ম-অনুভূতিতে।

রূপের জগতে রূপাতীতের সঙ্গে তাঁর ভাবসম্মিলন ঘটল। এই অনবদ্য ছবিটি ফুটে উঠেছে একটি গানে ঃ

"আমার দিন ফুরাল ব্যাকুল বাদল সাঁঝে
গহন মেঘের নিবিড় ধারার মাঝে।
বনের ছায়ায় জলছলছল সুরে
হৃদয় আমার কানায় কানায় পুরে।
খনে খনে এই গুরু গুরু তালে তালে
গগনে গগনে গভীর মৃদঙ বাজে ॥
কোন্ দূরের মানুষ যেন এল আজ কাছে,
তিমির আড়ালে নীরবে দাঁড়ায়ে আছে।
বুকে দোলে তার বিরহব্যথার মালা
গোপন-মিলন-অমৃতগন্ধ-ঢালা।
মনে হয় তার চরণের ধ্বনি জানি,
হার মানি তার অজানা জনের সাজে ॥"

কবিতাটি আবেগের নিবিড়তায় অনবদ্য। একটি বাদল সন্ধ্যার ঘনবর্ষণের বাস্তব ছবিকে কেন্দ্র করে রূপায়িত হয়েছে মরমীয়া প্রেমিকের যুগপৎ বিরহমিলনের আনন্দবেদনা। এর ভাষা, ছন্দ, ধ্বনি যেন অব্যক্তকে আমাদের চোখের সামনে অজানা রঙে রসে ব্যঞ্জনায় ব্যক্ত করে তুলছে। লেখকের কল্পনার প্রসারতায় এবং অনুভূতির নিবিড়তায় রূপ ও অরূপের রাজ্য এক হয়ে মিশে গেছে।

আধুনিক কালের নামকরা প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য কবিদের রচনা-সংগ্রহে এই কবিতাটির তুলনা পাওয়া হয়ত সহজসাধ্য হবে না। মনে প্রশ্ন জাগে, প্রকৃতিপূজার শ্রেষ্ঠকবি উইলিয়ম ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের অধ্যাত্ম অনুভূতি কি এমন গভীরভাবে অরূপের রাজ্যে গিয়ে পৌঁছেছিল? এ যেন শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব মহাজনের লেখা একালের একটি পরম পদাবলী।

এই রবীন্দ্রনাথেরই লেখা আর একটি প্রকৃতি-গীতি আছে, তার সুর এতই বিপরীত যে পড়তে গিয়ে অবাক হয়ে যেতে হয়।

সেদিনটা ছিল ভরা পূর্ণিমা। চারিদিকে উপছে উঠছে চাঁদের হাসি। মাটিতে ফুটেছে রজনীগন্ধা। নীল আকাশে উড়ে যাচ্ছে জোৎস্নার চন্দনমাখা, রাশিরাশি অলক মেঘ। ফুলের বনে ছুটে বেড়াচ্ছে এলোমেলো বাতাসের মৃদুমন্দ দোলা। এই সামান্য প্রাকৃতিক দৃশ্যের বাস্তব অভিজ্ঞতায় কবিচিত্ত উতলা হয়ে উঠল। তিনি গেয়েছেন ঃ

"চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে, উছলে পড়ে আলো।
ও রজনীগন্ধা, তোমার গন্ধসুধা ঢালো।
পাগল হাওয়া বুঝতে নারে ডাক পড়েছে কোথায় তারে—
ফুলের বনে যার পাশে যায় তারেই লাগে ভাল॥
নীল গগনের ললাটখানি চন্দনে আজ মাখা,
বাণীবনের হংসমিথুন মেলেছে আজ পাখা।
পারিজাতের কেশর নিয়ে ধরায় শশী, ছড়াও কি এ।
ইন্দ্রপুরীর কোন্ রমণী বাসরপ্রদীপ জ্বাল॥"

এখানে মহাকবির কল্পনায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে সুরলোকের এক বিরহিণী অপ্সরীর প্রিয়প্রতীক্ষায় বাসর-দীপ জ্বালার নিবিড় চিত্রখানি। ললাটে তাঁর শ্বেতচন্দনের আলপনা, লাবণ্য ঢলঢল অঙ্গে হংসমিথুনের তিলককাটা। তিনি ব্যাকুল আনন্দে আনমনা-ভাবে আকাশময় পারিজাতের কেশর ছড়াচ্ছেন।

এই রচনাটিও ভাবে ভাষায় ধ্বনিতে একেবারে অসামান্য। এও রবীন্দ্রকাব্য-সম্ভারের একটি শ্রেষ্ঠ রত্ন। যদি কোন প্রতিভাবান কবি ইংরেজী ভাষায় এর সুষ্ঠু অনুবাদ করতে পারতেন, তাহলে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে এও পেত সেরা সম্মান।

তবে কাব্যপ্রেরণার দিক থেকে বিচার করলে বলতে হয়, প্রথমটির সঙ্গে দ্বিতীয় লিরিকের কোথাও মিল নেই। প্রথমটির

মত এতে কোথাও নেই অরূপের সন্ধান, নেই বৈষ্ণব মরমিয়ার ব্যাকুলতা, নেই অধ্যাত্মসাধনার আকূতি। এর ব্যঞ্জনার মধ্যে শুধু অপরূপভাবে রূপায়িত হয়ে উঠেছে কবি-মানসের বাহ্যইন্দ্রিয়-পথে প্রকৃতি-সম্ভোগের চরম উল্লাস। স্বীকার করি, সে অনুভূতি যেমন গভীর, তেমনি সূক্ষ্ম। কিন্তু তার প্রসার একান্তভাবে রূপ-জগতের পরিধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সেই সীমাকে ছাড়িয়ে ইন্দ্রিয়াতীত রাজ্যে যাবার আকূতি কোথাও নেই। সৌন্দর্যপূজারী কবি যেন রূপ-জগতের অপরূপ মায়ায় আত্মহারা হয়ে গেছেন।

বলা যেতে পারে, এই কবিতার সৃষ্টিপ্রেরণার গোড়ায় জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে যে দৃষ্টিভঙ্গীর নিগূঢ় প্রভাব আছে, তা মূলতঃ প্রাচীন গ্রীক জাতির মত। তাই পড়তে পড়তে বিউটি-মিসটিক কবি কীটসের রচনার কথা মনে জাগে। কবিহিসাবে রবীন্দ্রনাথ যদি শুধু অরূপের পূজারী হতেন, তাঁর জীবনে ভোগবিরতির পাশে ভোগানন্দের সাধনা যদি না থাকত, তাহলে কি তাঁর লেখনী থেকে সৃষ্টি হতে পারত দ্বিতীয় গীতিকবিতাটি ?

কাব্যসাধনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ যেন একজন শ্রীরামকৃষ্ণদেব। তিনি তাঁর শিল্পসাধনায় 'যত মত তত পথ'-এর আদর্শে অনন্য-সাধারণ প্রতিভাবলে একসঙ্গে কালিদাস, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেলী, কীট্‌স প্রভৃতি পূর্বাচার্যদের যত কিছু বৈশিষ্ট্য আত্মস্থ করে বিচিত্রসিদ্ধির অধিকারী হয়েছেন। পৃথিবীর শিল্প-ইতিহাসে তাঁর তুলনা আছে কিনা, জানিনা।

*

*　　*

সেদিন তারিখ ছিল ২৪ সেপ্টেম্বর। ১৯৩৭ সাল। কঠিন রোগ ভোগের পর তিনি যেন উঠে পড়ে কাজে লেগেছেন। অবশ্য তখনও কোন লেখা বার হয়নি। কেবল ছবি আঁকছেন।

আমি "বাংলাকাব্য পরিচয়ে"র কাজ নিয়ে গত কয়েকদিন তাঁর কাছে যাইনি। আজ দেখা করতে যেতেই রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, নবীন সেনের বইগুলো কি দেখে রেখেছ ?

আমি উত্তর দিলুম, আজ্ঞে হ্যাঁ। "রৈবতক" ও "অমিতাভ" থেকে কয়েকটি অংশ বেছে রেখেছি। কাল নিয়ে আসব।

তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন, কেন ? যে কাজ আজকে হতে পারে, তা কালকের জন্য ফেলে রাখা কেন ?

রবীন্দ্রনাথ অসুখের পর থেকে সব কাজ শেষ করবার জন্য যেন ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। মনে হয়, আগে তাঁর ধারণা ছিল, মৃত্যু যখন আসবে, সময় থাকতে সাড়া দিয়ে আসবে। কিন্তু ১০ সেপ্টেম্বর হঠাৎ জ্ঞান হারাবার পর তিনি যেন বুঝতে পেরেছেন, আকস্মিকতার যিনি চিত্রগুপ্ত, তাঁর কালাকাল বোধ নেই। তাই যতদূর সাধ্য কাজ শেষ করে রাখবার একটা উগ্র ব্যগ্রতা মহাকবির মধ্যে দেখা দিয়েছে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে 'চীনা ভবনে' এসে আমার বাসা থেকে নবীন সেনের গ্রন্থাবলী নিয়ে গেলুম। তিনি দেখতে শুরু করে দিলেন। ক্রমে সন্ধ্যার আভাস দেখা দিল। তাঁর চোখের জোর এখনও বেশ রয়েছে। তবে অসুখের পর থেকে কানে কিছু কম শুনছেন।

শেষ পর্যন্ত তিনি প্রভাসের মহাসিন্ধুর বর্ণনামূলক কয়েকটা পঙ্‌তি মনোনীত করলেন। রহস্য করে বললেন, না, নবীন সেন লিরিকের রহস্য পুরোপুরি ধরতে পারেননি। শুধু মিল করলে কি কবিতা হয় ? আজকালকার দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিরাও হয়ত অনেক ভাল লিরিক লেখেন।

তারপর বললেন, দেখ, কাব্যপরিচয়ের জন্য আমারও কতকগুলো কবিতা বেছে রেখো। দাও "চিত্রা" থেকে, "ক্ষণিকা" থেকে। আর এদিকে "পূরবী", "মহুয়া" থেকেও।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "খেয়া" থেকে একটা দেব না ?

তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, দিও। "খেয়া"র মধ্যেও আমার একটা দিকের ভাল কবিতা আছে।

কথায় কথায় তামাসাচ্ছলে বললুম, আপনাকে নাকি সেদিন একজন ভক্ত জানিয়েছেন যে, "গীতাঞ্জলি" ও "খেয়া"র কবিতা আর "শান্তিনিকেতন"-এর প্রবন্ধ আপনার সবচেয়ে সেরা রচনা ? পৃথিবীর সাহিত্যে নাকি এদের তুলনা হয় না ?

রবীন্দ্রনাথ আমার কথাগুলি হয়ত ভালভাবে শুনতে পাননি। তাই একটু উত্তেজনার সঙ্গে বলতে লাগলেন, হ্যাঁ। তোমরা ওকথা যখন বল, আমার ভাল লাগে না। মনে মনে হাসি। তোমরা ভাব, আমি বুঝি সাধক, আমি ধর্মসংস্কারক। তাই আমার জীবনের খুঁটিনাটি নিয়ে তোমাদের এত চুলচেরা বিচার। তোমাদের ধারণা, আমার কাব্যে কেবল অসীমের সুরই বুঝি বেজেছে। তা নয়। আমার জীবনে আছে নানার ডাক। তাতে বিচিত্র সুর বেজে উঠেছে। তা যেন বীণার মত। তাতে একটি তার নেই, অনেক তার আছে। এক-একটা সময়ে এক-একটা ভাব জেগেছে, আমি তা 'রিয়েলাইজ' করেছি, কাব্যে প্রকাশ করেছি। আমার জীবনে আছে নানা ভাবের খেলা, তাই আমার কাব্যেও বেজেছে নানা সুর। আমি শিল্পী। তাই জীবনকে কখনও এড়িয়ে চলতে চাইনি। আমি সর্বাস্তিবাদী, সমগ্রকেই মানি।

রবীন্দ্রনাথের পঞ্চবটী মহাসত্তার বৈশিষ্ট্য এইখানে। মূলতঃ তিনি কবি। তাঁর সাধনা শুধু বৈরাগ্যের সাধনা নয়, শুধু ভোগের সাধনাও নয়। তাঁর তপস্যার শেষ লক্ষ হচ্ছে সমগ্র মহাজীবনকে পরিপূর্ণরূপে গ্রহণের তপস্যা।

সন্দেহ জাগে, ভারতবর্ষের জীবনসাধনার ইতিহাসে এ যেন নতুন বাণী। যুগযুগান্তর ধরে ভারতীয় মহাসাধকেরা রূপ ও অরূপ, সীমা ও অসীমের যে চিরন্তন দ্বন্দ্ব মানবজীবনে আছে, তা অবসানের

তপস্যা করে গেছেন। মনে হয়, ভারতবাসীর ব্যবহারিক জীবনে আচার্য শংকরের প্রভাবই সবচেয়ে প্রবল। শংকর বলেছেন, সীমা নেই, সবকিছু অসীম। কিন্তু পরম বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথের জীবনবাণী সেই মায়াবাদকে ছাড়িয়ে উঠেছে। তিনি বলেছেন, সীমা ছেড়ে অসীম কোথাও নেই। রূপের জগতের মধ্যেই মূর্ত হয়ে উঠেছে রূপাতীতের লীলা।

—নভেম্বর, ১৯৩৮।

॥ শেষ ॥

অনুযোজন

অনুযোজন—ক

গ্রন্থকারকে লেখা রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানি চিঠি

॥ ১ ॥

"উত্তরায়ণ"

কল্যাণীয়েষু শান্তিনিকেতন, বেঙ্গল

অনেকদিন থেকে কিশোরীর কোন চিঠিপত্র পাইনি। অথচ তাকে আমি অনেক চিঠি লিখেছি। কাজের কথাও ছিল। কিশোরী হয়ত কলকাতায় নেই কিন্তু আমার চিঠি কি তার কাছে পৌঁছয় না। কোথায় আছে, কী হয়েছে জানিয়ে তুমি আমাকে খবর দিয়ো। তোমার সংকলনের কাজ কতদূর অগ্রসর হল? প্রভাতকুমারের কাছ থেকে বইগুলো কি পেয়েছ? সঞ্চয়িতায় নূতন কোন্ কোন্ কবিতা যোগ করা হয়েছে, আমাকে ত জানাওনি। তুমি স্বয়ং কলকাতায় আছ কি অন্যত্র তাও নিঃসন্দেহে অনুমান করা যাচ্ছে না। আমাদের খবর ভাল। ইতি, ১৮ মে ১৯৩৭। শুভার্থী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ২ ॥

"উত্তরায়ণ"

কল্যাণীয়েষু শান্তিনিকেতন, বেঙ্গল

তোমাদের কাজ পুরোপুরি চলছে শুনে নিশ্চিন্ত ও খুশী হলুম। সুরেন্দ্র মৈত্রকে নিয়ে সংকলনের ধারাটা চালিয়েছ—ভালই হয়েছে, এরকম কাজে যথাসম্ভব রুচির সমন্বয় ভাল। সুরেশ চক্রবর্তী, নরেন্দ্র দেব প্রভৃতি আরো দুচারজন কবির কথা কিশোরীকে লিখেছিলুম, দেখো যদি কিছু পাওয়া যায়। আশা করি, কাজটা শেষ করতে বেশী দেরি হবে না। Oxford Book of Bengali Verse সম্বন্ধে আমার উৎকণ্ঠা নেই। ওর দায়িত্ব যাঁদের তাঁরা উদাসীনভাবে বছর তিন কাটিয়েছেন, আরো বছর পাঁচ কাটতে পারে। আমার নাম থাকাতে আমি জড়িয়ে পড়েছি, সেইজন্যেই স্থির থাকতে পারিনে। এখন ছুটির দিনে কোনো বই প্রভাতকুমার সহজে তোমার হাতে দেবেন না—* * *। কিন্তু সেই হিন্দী

বইয়ের চিহ্নিত কবিতাগুলি কি তুমি সেখানেই কপি করে নেও নি ? ভুল করেছ। এর জন্যে যথেষ্ট দেরি পড়বে। হয়ত দেড়মাস দুমাস—তারপরে কপি করা, মূলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা—সেও কম হাঙ্গামা নয়। ইতি, ১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪। শুভার্থী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ৩ ॥

"সেণ্টমার্কস"

কল্যাণীয়েষু আলমোড়া, ইউ-পি

* * * কতকগুলি আধুনিক কবিতা পেয়েছি। যেগুলি আমার পছন্দসই, দাগ দিয়ে কিশোরীকে পাঠালুম। মৈমনসিংহ গীতিকা থেকে যেটুকু বেছেছেন খুব ভালো লাগল। এটা বোধ করি পরিশিষ্টে দিতে হবে। বৃত্রসংহার থেকে ভদ্রগোছের কিছু পাওয়া সম্ভব হবে কি ? সুকুমার এবং সতীশের কবিতা যদি পাওয়া যায়, দেওয়া উচিত হবে। কুমুদরঞ্জন মল্লিককেও বাদ দিলে চলবে না। য়ুনিভার্সিটি কাব্যসংগ্রহে কোন কবিতা দেওয়া হয়েছিল বলে সেটা ত্যাজ্য হতে পারে না। পারতপক্ষে নতুন কবি কাউকে বাদ দিতে চাইনে। আধুনিক পাঠকদের কাছে আধুনিক কবিদের পূর্ণ পরিচয়ই আমি দিতে ইচ্ছে করি।

পরিশিষ্টে রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি যদি দাও তাহলে বইটা অসম্ভব রকম মোটা হবে। তাতে দোষ নেই। কিন্তু তার মানে দাম বাড়া অনিবার্য।

তাতে আমি আপত্তি করি। বইখানি সহজে সর্বসাধারণের জিনিস হওয়া চাই। আমার নিজের লেখা বেশী দিতে আমার মন চায় না। আমার কবিতা অন্য সকলের চেয়ে বেশী হয়ে গেছে সেজন্য কুণ্ঠিত আছি।

তুমি যে ভুলের তালিকা দিয়েছ সেগুলি রীতিমত ভুল। এরকম আরও অনেক ভুল আমার গ্রন্থাবলীতে অজ্ঞাতবাস যাপন করবে --সব সময়ে চোখেও পড়ে না। ইতি। (তারিখ নেই)

শুভার্থী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ৪ ॥

"উত্তরায়ণ"

কল্যাণীয়েষু শান্তিনিকেতন, বেঙ্গল

* * * হুমায়ুন কবীরের লেখাটি মূলের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ো এবং আরো যদি পাও তবে আর একটি দিতে পার। বৃত্রসংহারের যুগে যুক্তাক্ষরের পুরো মর্যাদা দেওয়া চলতি ছিল না, সেজন্য কবিকে দোষ দেওয়া যায় না—যদি কোনমতে চলার যোগ্য হয় তবে নিয়ো। লজ্জাবতী প্রভৃতিগুলো পরিত্যাজ্য। অক্সফোর্ডের বইয়ের কবিতা মূলের অনুযায়ী হওয়া চাই। সংক্ষিপ্তির দাবিতে কিছুকিছু বাদ যদি পড়ে ক্ষতি নেই। ইতি, ১১।৬।৩৭। শুভার্থী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ৫ ॥

কল্যাণীয়েষু কালিম্পঙ

যে গল্পকয়টির আদি ইতিহাস হাতড়িয়ে বেড়াচ্ছ, সেই তাদের আদিটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ—তার পরবর্তী অধ্যায় সব আমার গোচরে নেই। মোটের উপর বলতে পারি ওগুলো প্রবাসীতেই প্রথমে ছাপা হয়েছিল। অন্য কাগজের প্রতিযোগিতা তখন ছিল না বললেই হয়। প্রথম সংস্করণের বইগুলোর কবে সৃষ্টি এবং কোথায় অজ্ঞাত বাস আমি কিছুই জানিনে। * * জানে কিনা তাও জানিনে, জানলেও তুমি তার কাছ থেকে খবর পাবে কিনা বলতে পারিনা। পূর্বের লেখার সঙ্গে মেলাতে না পারলেও যে ভুলগুলো সুস্পষ্ট সেইগুলো সংশোধন করলেই যথেষ্ট হবে। কাব্যপরিচয় লোকে প্রশংসা করছে শুনে ভাবছি কুষ্টিতে আমার খ্যাতিস্থানের গ্রহ বদল হয়েছে। ইতি, ৩ আষাঢ় ১৩৪৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ৬ ॥

"উত্তরায়ণ"

কল্যাণীয়েষু শান্তিনিকেতন, বেঙ্গল

বিজয়ার আশীর্বাদ গ্রহণ করো।

সংকলনের কাজ আমার নয়, প্রমাণ হয়ে গেছে। যাঁদের লেখা নিয়েছি, তাঁরা বিরক্ত, পাঠকরাও উত্তেজিত। সকলেই দণ্ড উঁচিয়ে

আছেন। ঠাণ্ডা রাখা হয়েছে ভবিষ্যতের আশা দিয়ে—সেই ভবিষ্যৎ আমার হাতে নয়। দণ্ডধারীদের উপরই ভার রইল। আমি শান্তিঅন্বেষণে চললুম বানপ্রস্থে। নিজের কবিতা লিখে দণ্ডপুরস্কার যা পাই সেটা স্বীকার্য, পরের কবিতা কুড়োতে গিয়ে তাড়া খাওয়া বোকামির ফল। ক্লান্তির উপরে ভ্রান্তি চাপিয়েছি, এখন বোঝা ঝেড়ে ফেলে চক্ষু বুজব। ৬।১০।৩৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ৭ ॥

"উত্তরায়ণ"

কল্যাণীয়েষু শান্তিনিকেতন, বেঙ্গল

তুমি আমাদের ত্যাগ করে যাচ্ছ, এটা আমার পক্ষে অত্যন্ত অপ্রিয় ঘটনা। নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করবার পূর্বে আমার সঙ্গে একবার দেখা করে যেয়ো। ইতি, ৮।৩।৩৮। শুভার্থী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ৮ ॥

"উত্তরায়ণ"

কল্যাণীয়েষু শান্তিনিকেতন, বেঙ্গল

তুমি যেদিন কালিম্পঙ এসেছিলে ঠিক সেইদিন রেডিয়োতে আমার কবিতা পড়বার কথা, সেটা নিয়ে মনে উদ্বেগ ছিল। যেটা লিখেছি ঠিক সেইটে পড়িনি, পড়বার উপযুক্ত করে নিতে সময় দিতে হয়েছিল। * * * শান্তিনিকেতনে তোমার যা দুর্গতি ঘটেছিল তার সম্পূর্ণ বিবরণ আমার কাছে পৌঁছয়নি, কিন্তু কল্পনা করা কঠিন ছিল না। কেননা ওখানকার জনতার মধ্যে সৌজন্যের অভাব আমার সুবিদিত। বাংলাদেশীয় কোন জনতার মধ্যেই ঐ গুণের প্রাচুর্য দেখা যায় না। যাঁরা ওখানে টিকে আছেন, তাঁদের অনেকের ইতিহাসেই ঈর্ষার আঘাত ও অসম্মানের লাঞ্ছনা ঘটেছে। সেটা যে এখানকারই বিশেষ হাওয়ার গুণ তা বোধ হয় না—এই হাওয়াটা বিশেষভাবে গৌড়ীয়, ম্যালেরিয়ারই সহযোগী। ইতি, ৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৯। শুভার্থী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অনুযোজন—খ

১। ভাইসরয়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের মূল ইংরেজী চিঠির পাঠ এইরূপ

"The enormity of the measure taken by the Government in the Punjab for quelling some local disturbances has, with a rude shock, revealed to our minds the helplessness of our position as British subjects in India. The disproportionate severity of the punishments inflicted upon the unfortunate people and methods of carrying them out, we are convinced, are without parallel in the history of civilized Governments, barring some conspicuous exceptions, recent and remote. Considering that such treatment has been meted out to a population disarmed and resourceless, by a power, which has the most terribly efficient organization for destruction of human lives, we must strongly assert that it can claim no political expediency, far less moral justification. The accounts of insults and sufferings undergone by our brothers in the Punjab have trickled through the gagged silence, reaching every corner of India and the universal agony of indignation roused in the hearts of our people has been ignored by our rulers, possibly congratulating themselves for imparting what they imagine as salutary lessons. This callousness has been praised by most of the Anglo-Indian papers, which have in some cases, gone to the brutal length of making fun of our sufferings, without receiving the least check from the same authority, relentlessly careful in smothering every cry of pain and expression of judgment from the organs representing the sufferers. Knowing that our appeals have

been in vain and that the passion of vengeance is blinding the noble vision of statesmanship in our Government, which could so easily afford to be magnanimous as befitting its physical strength and moral traditions, the very least I can do for my country is to take all consequences upon myself in giving voice to the protest of the million of my countrymen, surprised into a dumb anguish of terror."

২। গান্ধীজির লেখা "General Dyer" প্রবন্ধটির মূল ইংরেজী পাঠ এইরূপ :

"The Army Council has found General Dyer gulity of error of judgement and advised that he should not receive any office under the crown. Mr. Montagu has been unsparing in his criticism of General Dyer's conduct. And yet somehow or other I can not help feeling that General Dyer is by no means the worst offender. His brutality is unmistakable. His abject and unsoldier-like cowardice is apparent in every line of amazing defence before the Army Council. He has called an unarmed crowd of men and children—mostly holiday-makers—'a rebel army.' He believes himself to be the saviour of the Punjab in that he was able to shoot down like rabbits men who were penned in an inclosure. Such a man is unworthy of being considered a soldier. There was no bravery in his action. He ran no risk. He shot without the slightest opposition and without warning. This is not an 'error of judgement.' It is paralysis of it in the face of fancied danger. It is proof of criminal incapacity and heartlessness. * * * * "
(Young India, dt. July 14, 1920)

অনুযোজন—গ

শান্তিনিকেতন প্রবাসের দিনপঞ্জী থেকে কয়েকপাতা

॥ ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬ ॥

আজ বিকালে সবেমাত্র বাসায় ফিরেছি, এমন সময়ে বিশ্বভারতীর মুসলিম সংস্কৃতির গবেষণা বিভাগের অধ্যাপক মৌলনা জিয়াউদ্দীন এসে ডাকলেন। বললেন, গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন ত চলুন, আমি যাচ্ছি।

মৌলনা বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্র। জাতে পাঞ্জাবী। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বিশেষ স্নেহ করেন, শুনলুম। তাঁর সঙ্গে 'উত্তরায়ণে' গিয়ে উপস্থিত হলুম।

মহাকবি তখন সাময়িকভাবে থাকতেন 'উদয়নে'র একতলায়। মৌলনা আমাকে সেখানে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে পরিচয় দিলেন।

রবীন্দ্রনাথ হাসতে হাসতে বললেন, তোমার মুখ ত প্রায় ভুলেই গেছি হে! এতদিন কোথায় ছিলে?

দশ বারদিন হল, বিশ্বভারতীর কাজে যোগ দিয়েছি কিন্তু মহাকবিকে প্রণাম করতে আসতে পারিনি। তাই হয়ত তাঁর কথায় একটু অভিযোগের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ছিল। মৌলনা তাড়াতাড়ি আমার হয়ে উত্তর দিলেন, আগেই আপনার কাছে আসবার ওর খুব ইচ্ছে ছিল। কিন্তু এখানে নতুন এসেছে, লাজুক মানুষ। একলা আসতে সাহস করেনি। তাই আজ সঙ্গে করে আনলুম।

রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, নতুন কাজ কি রকম লাগছে তোমার?

আমি সবিনয়ে উত্তর দিলুম, সবচেয়ে আমার শান্তিনিকেতন জায়গাটা ভাল লাগছে।

তিনি সাগ্রহে বললেন, তুমি যে ইতিমধ্যে এখানকার পরিমণ্ডলকে ভালবাসতে পেরেছ, শুনে ভাল লাগল। এখানে এমন কেউ কেউ আছেন যাঁরা অনেক বছর থেকেও শান্তিনিকেতনকে ভালবাসতে

পারেন নি। এখানে যে কাজ চলছে, তার একটি সমগ্র রূপ আছে। শান্তিনিকেতনের সেই ভাব-রূপটিকে দেখবার চেষ্টা করো।

মহাকবি আরও বললেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া সবেমাত্র শেষ করে পড়ানোর কাজে লেগেছ। হয়ত প্রথম প্রথম মনে হবে, একাজ বড় নিরস। কিন্তু ধৈর্য রেখো। ছেলেদের সঙ্গে মিশছ ত? মিশবে। তাদের দূরে দূরে রাখবে না। তাদের মনের মধ্যে ঢোকবার চেষ্টা করবে। ওদের সঙ্গে কেবল শিক্ষাদানের সম্বন্ধ হলে চলবে না, যথার্থ আত্মীয়ের সম্বন্ধ হওয়া চাই। ওরা যেন তোমাকে ওদের আপনজন ভাবতে পারে। তাহলে আনন্দ পাবে। তখন একাজ খুব ভাল লাগবে। হয়ত তুমি জান না, আমিও অনেক দিন একাজ করেছি। তখন তুমি জন্মাওনি, বোধ হয়।

তারপর একটু তামাশা করে প্রসঙ্গটা শেষ করলেন, কে জানে, হয়ত আমি শিক্ষকই হতাম,—যদি না কবিতা লিখতে হত।

॥ ৬ অক্টোবর, ১৯৩৬ ॥

রবীন্দ্রনাথ 'পুনশ্চে'র বারান্দায় বসে একলা-একলা ছবি আঁক-ছিলেন। তাঁর ফ্লু র মত হয়েছে।

আমি বললুম, আপনি ছবি আঁকছেন। তবে আজ আসি। এখন আপনাকে বিরক্ত করা উচিত হবে না।

তিনি উত্তর দিলেন, না না, বস না। আঁকা আমার শেষ হয়েছে। তোমরা সাহিত্যিক, ছবি আঁক না,—অবশ্য আমিও সাহিত্যিক—কিন্তু ছবির নেশা যে কি জিনিস, তা তোমাদের বোঝাতে পারব না। যখন সে নেশা ধরে, তখন আঁকতে না বসে উপায় থাকে না।

তারপর দু-একটি সাধারণ কথাবার্তার পর শুরু করলেন, শোন, একটা কথা তোমাকে বলি। তুমি এখানে বাংলাসাহিত্য পড়াচ্ছ। আমি চাই এখানকার বাংলা পড়ানোর মধ্যে যেন একটি বিশেষত্ব

থাকে। আমি নিজে যখন ক্লাস নিতাম, তখন এ বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করতাম। তুমি ত সতীশ রায়ের নাম শুনেছ? ওরাও সেইভাবে কাজ করত। তারপর অনেকদিন সেইভাবে আর কাজ হয়নি। অবশ্য সে সব প্রণালীর একস্‌পেরিমেণ্ট করবার জন্য মাঝে মাঝে দু-একজনকে বলেছিলাম। কিন্তু এখানকার শিক্ষাধারাকে যথার্থভাবে সফল করতে হলে যে ধরনের উৎসাহী কর্মী চাই, তা সব সময়ে পাইনি। তাছাড়া, পরে এখানকার শিক্ষাধারায় পরীক্ষা পাশের শনি প্রবেশ করলে। পরীক্ষার ত আবার নির্দিষ্ট কারিকুলাম আছে, আরও কত কি আছে!

মহাকবি একটু থেমে বলতে লাগলেন, একদিন আমি কি ভাবতাম জান? এখানকার পাঠভবনের বেশির ভাগ ক্লাসে বাংলা সাহিত্যের জন্য কোন নির্দিষ্ট শিক্ষাগ্রন্থ থাকবে না। শিক্ষক তাঁর নিজের বই নিজে রচনা করে নেবেন। তাঁর বই-এ প্রধানতঃ থাকবে বিজ্ঞানের নানা বিষয়। বৈজ্ঞানিক বিষয় নিলে তা ছেলেদের কাছে নিশ্চয়ই চিত্তাকর্ষক হবে। তাদের মন আমাদের চেয়ে বেশী বস্তুবাদী। তত্ত্বের চেয়ে তথ্যে তাদের অনুরাগ। তারা ভাবের বড় বড় কথা বা উপদেশ পড়ে বিশেষ আনন্দ পায় না। তাদের নতুন পৃথিবীতে তারা চারিদিকে দেখতে পায় যত অজানা বস্তু। সে সব বস্তুর বিষয়ে জানবার জন্য স্বভাবতঃ তারা খুব উৎসুক হয়ে থাকে। তাদের সেই সব দৈনন্দিন জীবনের পরিচিত বস্তুর সম্বন্ধে বিস্তারিত পরিচয় দিয়ে শিক্ষার কাজ শুরু করতে হবে। অবশ্য পাঠের বিষয়টি হবে বিজ্ঞানের কিন্তু তার আলোচনা করার দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রকাশরীতি হবে সাহিত্যিকের। ধর, পাথুরে কয়লার জন্ম সম্বন্ধে শিক্ষক যেন ক্লাসে আলোচনা করলেন। হয়ত তিনি বললেন, এই ত সামনের গাছগুলো এদেরই ত আর এক রূপ হচ্ছে পাথুরে কয়লা। অনেক অনেক বছর আগের কথা। আদিম পৃথিবীতে তখনও ডাঙা ভাল করে জমাট বাঁধেনি, হয়ত মানুষ ছিল না একটিও। ছিল শুধু পলি

মাটি আর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ। তাদের শুকনো পাতা, ডালপালা মাটির উপর পড়ে পড়ে স্তরে স্তরে জমা হত। তারপর ঘন ঘন ভূকম্পনে, ঝড়ে কত গাছ পড়ে যেত। এসবের উপর স্তরে স্তরে জমল মাটি। তারপর কত লক্ষ বছর ধরে মাটির তলার ভারে পিষ্ট হয়ে কাঠ জমাট বেঁধে শক্ত পাথরের মত হল আর ভিতরের অঙ্গার ক্রমশঃ রূপান্তরিত হল পাথুরে কয়লায়।

মহাকবি বলে যান, আলোচনা করার সময় মনে রাখতে হবে, বলা যেন চিত্তাকর্ষক হয়। শব্দ নির্বাচনে সাবধানতা চাই। আর চাই বলার ভঙ্গীতে জীবনের প্রতি সাহিত্যিকসুলভ বিস্ময়বোধের প্রেরণা। আমি কি করতাম, জান? ক্লাসে আমার আলোচনা শেষ হলে ছেলেদের নানা প্রশ্ন করতাম। তাতে তাদের মনে না-বোঝা কথা আরও স্পষ্ট হয়ে যেত। তারপর এক একটি ছেলেকে ধরে সবটা বলতে বলতাম। এইভাবে ছেলেদের বলবার ক্ষমতা, ঠিক ঠিক শব্দনির্বাচনের দক্ষতা এবং লজিক্যালি ভাববার অভ্যাস গড়ে তোলবার চেষ্টা করতাম। বলার সময় যার যেখানে আটকাত আমি নিজে শব্দ যোগ করে দিয়ে সাহায্য করতাম। শুধু ছেলেমেয়েরা কেন, আমার কাছে ত কত লোক আসা যাওয়া করে। প্রায়ই দেখি, তারা কথা গুছিয়ে বলতে পারে না। কতকগুলি শব্দ বলে, কতকগুলি উহ্য রাখে, কতকগুলি বা আগের শব্দ পিছনে যোগ করে বক্তব্য শেষ করে। এই অস্পষ্টভাবে প্রকাশ করার পিছনে আছে স্পষ্টভাবে চিন্তা করার অনভ্যাস।

মহাকবির কথা শুনতে শুনতে আমার মন ভরে গেল। ভাবতে লাগলুম, শিক্ষিত মন আর অশিক্ষিত মনের পার্থক্য ত এইখানেই হওয়া উচিত। শিক্ষিত লোক চিন্তা করবে যুক্তির শৃঙ্খলে, মনের ভাব প্রকাশ করবে স্পষ্টতার উজ্জ্বলতায়। অশিক্ষিত লোকের ভাবা ও বলার মধ্যে থাকবে অপরিণত মনের স্বাভাবিক বিশৃঙ্খলা। শিক্ষার মূল লক্ষ ত হচ্ছে মানুষের মনকে তৈরী করা।

রবীন্দ্রনাথ আবার আরম্ভ করলেন, তুমি আমার পদ্ধতি একস্‌পেরিমেণ্ট করে দেখ না। যদি কিছু করতে পার ত তাতে স্থায়ী কাজ হবে। তবে শুধু বলানোতে শেষ করলে চলবে না। আরও একটু এগিয়ে যেতে হবে। ছাত্রদের দিয়ে বলানো শেষ হলে বিষয়টি প্রবন্ধাকারে তাদের লিখতে বলবে। তখন সেই লেখাগুলি যত্নের সঙ্গে দেখে দেবে। বানান বা ব্যাকরণগত বা লিখনরীতির সব কিছু ভুলত্রুটি সংশোধন করা চাই, সঙ্গে সঙ্গে তা আবার বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। তারপর সংশোধন করা প্রবন্ধটি প্রত্যেক ছাত্রকে একটি পৃথক খাতায় অনুলিপি করে রাখতে বলবে। এইভাবে সেই খাতায় প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ একত্র জমা হলে প্রত্যেকের নিজস্ব পাঠ্যপুস্তক তৈরী হয়ে যাবে। যদি কোন ছাত্রের রচনায় মৌলিক চেষ্টা দেখতে পাও, যদি বুঝতে পার সম্পূর্ণ নিজের ধারায় লিখছে, তাকে সেই-ভাবেই লিখতে উৎসাহ দেবে। দেখো, প্রত্যেক ছাত্রকে শেখানোর জন্য যতদূর সম্ভব ব্যক্তিগত মনোযোগ দেওয়া চাই। আমি ক্লাসের মধ্যে সকলের জন্য একভাবে টানা-ব্যাখ্যা বলে গিয়ে অধ্যাপনা করা মোটেই ভালবাসি না। ক্লাসটা সমগ্রভাবে অধ্যাপনার ইউনিট নয়, এক একটি ছাত্রকে এক একটি ইউনিট বলে গণ্য করা চাই।***

আমি এতক্ষণ অবাক হয়ে শুনছিলুম। তিনি চুপ করলে জিজ্ঞাসা করলুম, আপনি প্রবন্ধ পড়ানোর কথা ত বললেন। কিন্তু কবিতার বেলায় কি করা যাবে?

রবীন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, আমি কবিতাও পড়াতাম। ধর, অনাথপিণ্ডদসুতার কবিতাটি নিলাম। প্রথমে ছেলেদের বলে দিতাম, আগে থেকে তোমরা কবিতাটি পড়ে ক্লাসে এস। আমি তখন সে যুগের একটার পর একটা ছবি গল্পের আকারে ছেলেদের সামনে তুলে ধরতাম। যাতে তাদের ভিতরে কল্পনার উদ্রেক হয়। যাতে তাদের বোধ হয়, তারা যেন সেই প্রাচীন যুগে ফিরে গেছে। আমি ছন্দটাও খুব নিতাম। বাংলাভাষার বেশির ভাগ কবিতা দু-মাত্রা বা তিন-

মাত্রার। আমি প্রথমে ছন্দের মোটামুটি কথাগুলো ছেলেদের বুঝিয়ে দিতাম। তারপর মাঝে মাঝে কথাগুলোকে ওলোট-পালট করে দিয়ে বলতাম, এবার তোমরা এগুলোকে সাজিয়ে কবিতা লেখ। তারা যাতে একটু-আধটু কবিতা লেখার অভ্যাস করে, তার জন্য উৎসাহ দেওয়া মন্দ নয়। অবশ্য বেশী উৎসাহ দিলে আবার শেষে তাদের থামতে বলতে বাধ্য হতে হবে। তবে ছন্দের কানটা যাতে তৈরী হয়, সেদিকে নজর রাখা ভাল বইকি।***

সেদিন বিদায় নেবার আগে মহাকবি বললেন, তুমি যদি এই নতুন পদ্ধতিতে কাজ আরম্ভ কর, প্রথম প্রথম একটু বেশী পরিশ্রম করতে হবে। কিন্তু কিছুদিন ধরে ছাত্রেরা এইভাবে অভ্যাস করলে দেখতে পাবে ব্যাপারটা অনেক সহজ হয়ে গেছে। তখন ছাত্রেরা অল্প আয়াসেই নির্ভুলভাবে বলতে পারবে, লিখতে পারবে। ক্রমশঃই তাদের মন সতেজ হয়ে উঠবে, সজীব হয়ে উঠবে, নিজের চেষ্টায় ভাব গ্রহণ করতে পারবে। আবার নিজের ভাষায় ভাব প্রকাশ করতেও পারবে।

॥ ১০ এপ্রিল, ১৯৩৭ ॥

"গল্পগুচ্ছ" সম্পাদনার কাজ নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথ বললেন, প্রথম ভাগের প্রথম দুটি গল্প 'ঘাটের কথা' আর 'রাজপথের কথা' "গল্পগুচ্ছ" বইখানা থেকে বাদ দিও। এদের কোনটাই ঠিক ছোটগল্প নয়, শুধু সেনটিমেণ্টাল কথায় ভরতি। তাছাড়া 'রাজপথ' ত "বিচিত্র প্রবন্ধে" প্রকাশিত হয়েছে।

আমি বললুম, হ্যাঁ, এটি "বিচিত্র প্রবন্ধে"র পুরোতন সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছিল, শুনেছি। নতুন সংস্করণে নেই।

—তাহলে এ দুটিকে বরং "গল্পগুচ্ছে"র পরিশিষ্টে দেওয়া সংগত হবে।

ক্রমে যতিচিহ্নের প্রসঙ্গ উঠল। রবীন্দ্রনাথ বললেন, আমি বেশী চিহ্ন ব্যবহার পছন্দ করিনা। ইংরেজী ভাষায় 'রাম শ্যাম যদু এলেন'

লিখতে গেলে প্রত্যেকের নামের শেষে কমা চিহ্ন বসে। বাংলায় তার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। ফাঁক ফাঁক লিখলেও রামশ্যামযদু এখানে সমাসবদ্ধ বলে ধরা যায়। আমি অযচ্ছল বিস্ময় চিহ্ন দেবারও পক্ষপাতী নই। আমরা খুব সেনটিমেণ্টাল কিনা। তাই কারণে অকারণে বিস্ময় চিহ্ন ব্যবহার করতে ভালবাসি। জিজ্ঞাসা চিহ্ন সম্বন্ধেও একটা কথা বিচার করে দেখা দরকার। যে বাক্যের মধ্যে 'কি' বা 'কেন' বা 'কোথায়' প্রভৃতি জিজ্ঞাসাবোধক শব্দ আছে, সেখানে ত ভাষার মধ্যে জিজ্ঞাসার ভাবটি স্পষ্ট বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে আবার বাইরের চিহ্ন দিয়ে তা বোঝাবার চেষ্টা কেন? তাই সেই সব বাক্যে জিজ্ঞাসার চিহ্ন দিও না।

আমি সুযোগ পেয়ে আর একটি প্রসঙ্গ তুললুম। বললুম, "গল্পগুচ্ছে"র প্রচলিত সংস্করণের পাঠে কোন গল্পে 'করলুম', 'এলুম' আছে, আবার কোথাও 'করলাম', 'এলাম' আছে। এ বিষয়ে আপনার নির্দেশ কি বলুন।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, আমি আমার লেখায় 'করলুম', 'করলাম', 'করলেম' তিন রকম বানানই ব্যবহার করেছি। মুখে যখন কথা বলি তখনও সময়বিশেষে ক্রিয়া পদগুলির তিন রকম রূপই ব্যবহার করি। বিভিন্ন সময়ের লেখা বিভিন্ন বই থেকে নিয়ে ছোট গল্পগুলি একত্র করা হয়েছে ত, তাই নানা রকম বানান রয়ে গেছে। "গল্পগুচ্ছ" বইখানার মধ্যে এই শব্দগুলিকে এক ধরনের বানানে প্রকাশ করাই উচিত হবে।

—এদের মধ্যে কোন্‌টি বাংলাভাষার ঠিক রূপ?

রবীন্দ্রনাথ হাসতে হাসতে বললেন, কলকাতায় এখন যদিও 'করলাম', 'এলাম'-এর বেশী প্রচলন, তবু 'করলাম', 'এলাম' নদীয়া জেলার ভাষা। কলকাতার আদি ভাষা হচ্ছে 'করলুম', 'এলুম'। মনে হয়, 'লুম'-ই প্রাচীন বাংলাভাষাসম্মত। কেননা,

প্রাচীন বাংলাসাহিত্যে দেখি 'গেনু' 'হেরিনু' প্রভৃতি। 'উ' থেকেই পরবর্তীকালে 'উম্'-এর উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে হয়।

॥ ১০ জুলাই, ১৯৩৭ ॥

"বাংলাকাব্য পরিচয়ে"র কাজ এগিয়ে চলেছে। রবীন্দ্রনাথ আজ মাইকেল মধুসূদন দত্তের গ্রন্থাবলী দেখছিলেন। 'কুসুম' বলে কবিতাটি পড়তে লাগলেন,

"কেন এত ফুল তুলিলি, স্বজনি,
ভরিয়া ঢালা।
মেঘাবৃত হলে পরে কি রজনী
তারার মালা।
আর কি যতনে কুসুম রতনে
ব্রজের বালা।
আর কি পরিবে কভু ফুলহার
ব্রজকামিনী।
কেন লো হরিলি ভূষণ লতার
বনশোভিনী।
অলি বঁধু তার, কে আছে রাধার—
হতভাগিনী।"

কবিতাটি পড়তে পড়তে বললেন, আধুনিক বাংলাসাহিত্যে মধুসূদনের রচনার মধ্যেই প্রথম সত্যিকার লিরিক-কবিতার সুর ফুটে উঠেছিল।

রবীন্দ্রনাথ কয়েকদিন আগে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "মন্দ্র" কাব্য দেখছিলেন। তিনি শেষ পর্যন্ত 'সিন্ধু' কবিতাটি নির্বাচিত করলেন। পড়তে লাগলেন,

"তুমি যে হে গর্জিছই! চট কেন? শোন পারাবার।
দুটো কথা বলি শোন। তোমার যে ভারী অহংকার।
শোন এক কথা বলি। দিনরাত করিছ শোঁ শোঁ।
তোমার কি কাজকর্ম নাই?—আহা, চট কেন, রোস।***

এক হাতে নাশ তব, এক হাতে গঠনে নিরত,
যুগে যুগে বহে যাও গম্ভীর কল্লোলি নিরবধি।
ন্যায় সম নিঃসংকোচে নিজ কার্য সাধিছ জলধি।
তুমি গর্বী, তুমি অন্ধ, তুমি বীর্যমত্ত, তুমি ভীম,
কিন্তু তুমি শান্ত, প্রেমী। তুমি স্নিগ্ধ, নির্মল, অসীম।* **"

রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করলেন, দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলাকাব্যে একটি বিশেষ সুরের সূচনা করেছিলেন। তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল, হালকা কথা বলতে বলতে গভীর ভাবে ডুব দিতেন। আবার গভীর কথা বলতে বলতে হঠাৎ হালকা সুর এনে সাধারণ স্তরে নেমে আসতেন। মডার্ন পদ্যের যেটা প্রধান বৈশিষ্ট্য বাংলা সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্র-রচনায় প্রথম তার সূচনার আভাস জেগে উঠেছিল।

॥ ১৫ জুলাই, ১৯৩৮ ॥

কয়েকদিন ধরে কলাভবনের অধ্যক্ষ শ্রীনন্দলাল বসুর সঙ্গে বেশ আলোচনা হল।

জিজ্ঞাসা করেছিলুম, শান্তিনিকেতনের শিক্ষাপদ্ধতির বিশেষত্ব কি? শিক্ষক হিসাবে আপনি ছাত্রদের নিয়ে কি করেন?

নন্দলাল উত্তর দিলেন, বরাবর শুধু চেয়েছি, আমি শিল্পী হব আর শিল্পীর মনের মধ্যে শিল্পীকে জাগাবার সাহায্য করব। সেটাই সব চেয়ে বড় কথা। এখানে কাজ করতে আসবার সময় অবনীবাবু পরামর্শ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, দেখ, আমড়াগাছকে আম গাছ করার চেষ্টা কখনো করো না। তিনি আরও বলেছিলেন, মনে রেখ, নুড়িতে জল ঢেলে যেমন গাছ হয় না, তেমনি যাদের মনের মধ্যে শিল্প নেই তাদের কখনো শিখিয়ে পড়িয়ে শিল্পী করা যায় না। শিক্ষকের কাজ—মালির কাজ। কিছুই সে সৃষ্টি করে না, বীজ পেলে, চারা পেলে যত্ন করে বাড়িয়ে তোলে, বাঁচিয়ে রাখে।

প্রশ্ন করলুম, কি ভাবে সেই কঠিন কাজ করেন? আপনার শিক্ষাপদ্ধতি কি রকম?

প্রশ্ন শুনে নিমেষে প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী সজাগ হয়ে উঠলেন, বললেন, যে-পদ্ধতিতে অন্যান্য আর্ট স্কুলে কাজ শেখানো হয়, আমি মনে করি, তা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। কর্তৃপক্ষেরা বছরে বছরে ভাগ করে সিলেবাস করেছেন। এক বছর কপি করান, এক বছর ড্রয়িং শেখান, এক বছর বা নেচার স্টাডি করান। শেষে কম্পোজিশন শেখান বা অরিজিন্যাল কাজ করান। গোড়া থেকে ছাত্রদের কল্পনাকে বাড়াবার সাহায্য করেননা। শেষের দিকে যখন কল্পনার কসরৎ করবার চেষ্টা করেন তখন তার মধ্যে কল্পনা একেবারে মারা গেছে। মানুষের খাওয়া-চলা-ভাবার কাজ যুগপৎ একসঙ্গে চলে। কেউ যদি এক বছর ধরে শুধু খায়, তার পর এক বছর ধরে শুধু ভাবে, তাহলে তার সত্যিকার বিকাশ কি করে হয়? অ্যাকাডেমির প্রচলিত পদ্ধতি সেই রকম। ক্লাস বলতে আমাদের এখানে কিছু নেই। আমি এক-একটি মানুষকে ইউনিট ধরি। এখানকার কাজের ধারা প্রধানতঃ অরিজিন্যাল আঁকার মধ্যে দিয়ে। কপির পর কপি করিয়ে কারো হাত পাকাবার চেষ্টা করা হয় না। আমাদের কি ধরনের পদ্ধতি জান? বাঘ যেমন বাচ্চাদের শিকার শেখায়। সে নিজে শিকার করে, বাচ্চারা তা দেখে শেখে। নিজে শিকার না করে সে যদি তাদের শিকার-শেখার ক্লাস খুলত, তাহলে বাচ্চারা ত শিখতই না, সে নিজে আর বাচ্চারা সকলেই না খেতে পেয়ে মারা যেত। যিনি শেখাবেন আর যে শিখবে—তুজনের মধ্যে মনে মনে সম্বন্ধ স্থাপন করার খুব দরকার। এ ত হাত দিয়ে হাতের কাজ শেখানো নয়,—প্রাণ দিয়ে প্রাণ জাগানো। আমার ধারণা, শুধু টেকনিক শিখে সত্যিকার কোন কাজ হয়না। ভিতরের শিল্পী জাগলে টেকনিক খুঁজে পাবেই সে। শিল্পের উপর অনুরাগই ছবির প্রাণ। টেকনিকের কৌশল দিয়ে অনুরাগ সৃষ্টি করা যায় না। বরং অনুরাগ থাকলে টেকনিক অনায়াসে শেখা যায়।

নন্দলাল আরও বললেন, কোন নূতন ছাত্র আমাদের কাছে এলে তাকে প্রথমেই বলি, একটি ছবি আঁক,—মন থেকে অরিজিন্যাল ছবি, কোন-কিছুর কপি নয়। সেই ছবিখানা দেখে মোটামুটি ছেলেটির সম্বন্ধে একটা ধারণা করে নিই। তারপর থেকে শেখানো শুরু হয়। অনেক দিন আগের কথা। তখন অবনীবাবুর কাছে কাজ শিখি, সেই সময়ে বিখ্যাত জাপানী শিক্ষাব্রতী ওকাকুরা একবার আলোচনা-প্রসঙ্গে একটা চমৎকার কথা বলেছিলেন। তিনি একটা ত্রিভুজ এঁকে তার তিন দিকে তিনটি শব্দ লিখেছিলেন, ট্র্যাডিশন, নেচার আর অরিজিন্যালিটি। তারপর বলেছিলেন, শিল্প নির্ভর করে যুগপৎ এই তিনটে জিনিসের উপর। কোন-একটিকে বাদ দিয়ে যে শিল্পসৃষ্টি হয় তা পূর্ণ নয়। ধর যেখানে ট্র্যাডিশন নেই, আছে শুধু নেচার আর অরিজিন্যালিটি, সেশিল্প সব সময়েই যেন শৈশবে থাকে, তার একটা অতীতের দৃঢ় ভিত্তি থাকে না। শিল্পীর খামখেয়াল তার মধ্যে প্রচণ্ড হয়ে থাকে। আবার যেখানে নেচার নেই, শুধু ট্রাডিশন আর অরিজিন্যালিটি আছে, সেখানে শিল্পের মধ্যে তাজা প্রাণ থাকে না। যেখানে অরিজিন্যালিটি নেই, শিল্প সেখানে হয়ে পড়ে একঘেয়ে। ওকাকুরার ঐ কথাটি শিল্প-শেখানোর কাজে আমাদের খুব সাহায্য করেছে। ছাত্রদের মধ্যে এই তিন দিকে একসঙ্গে বিকাশ যাতে হয় তার চেষ্টা আমরা করি। প্রথমে আঁকাই অরিজিন্যাল ছবি। যেখানে তার ভুল হয় বা যে জিনিসটা ভাল হয় না দেখি, তখন সেই ধরনের কপির কাজ করাই। তারপর বলি প্রকৃতি থেকে সেই ধরনের কাজ করতে। আবার অরিজিন্যাল করে, আবার কপি করে, আবার প্রকৃতি থেকে আঁকবার চেষ্টা করে। ঘুরে ফিরে সেই অরিজিন্যালিটি, ট্র্যাডিশন, নেচার বারবার আসতে থাকে।

জিজ্ঞাসা করলুম, এই ধরনে কাজ যে করান তার কি কোন নির্দিষ্ট সিলেবাস আছে? ধরুন, প্রত্যেক বছরে অবশ্যকর্তব্যরূপে

একটা নির্দিষ্ট সংখ্যার কপি বা অরিজিন্যাল কাজ ছাত্রদের করতেই হবে—এমন কোন ব্যবস্থা করেছেন? তাছাড়া পাঁচ বছরের কোর্সটা বছরের হিসেবে স্তরে স্তরে ভাগ করা কি?

নন্দলাল একটু হেসে জবাব দিলেন, না। আমাকে অনেকে অনুরোধ করেন, বছর বছর ভাগ করে একটা সিলেবাস তৈরি করুন। আমি বলি, বছর-বছরের সিলেবাস কেমন করে করতে হয় জানি না—আমার একেবারে পাঁচ বছরের সিলেবাস। যে-কোন ছাত্রকে পাঁচ বছর পরে দেখবে শিল্পের টেকনিকের দিক থেকে যা যা শেখবার তা সে শিখেছে। কেমন করে শিখেছে, তা সে বলতে পারে না। কবে, কিসের পর যে কি শিখেছে, তাও সে বলতে পারে না। কতকগুলি শিক্ষণীয় বিষয় শেখাতে হবে—যেমন বস্তু দেখে নকল করা, মন থেকে কোন কাল্পনিক বস্তুর আকার দেওয়া, পারস্পেকটিভ, তুলির টান দেওয়া, রং মেশানো ইত্যাদি। এখানকার শিক্ষকদের মনে মনে সেগুলি ঠিক করা আছে, আর ছাত্রেরা সেগুলি শিখছে কি না—সে-বিষয়ে সব সময়ে তাঁরা দৃষ্টি রাখেন। গোড়া থেকে আমরা তাদের মনের ভিতরের কল্পনাকে জাগাবার সাহায্য করি। ঠিক বলতে গেলে, আমরা কাউকে শিল্প শেখাই না—শুধু তার মনে শিল্পের উপর যে অনুরাগ থাকে, তা বাড়িয়ে দিই। তারপর সে আপনা থেকেই খুঁজে খুঁজে জিজ্ঞেস করে করে শেখে। আমি জানি, তার মনে এই অনুরাগ থাকলে সে যেখানেই থাকুক শেখবার পথ বার করে নেবেই। শুনেছি, সাইকেল চালাবার সময় পথের দিকে দৃষ্টি রাখলেই সাইকেল ঠিক চলে—গাড়ির দিকে মন দিলেই পড়ে যেতে হয়। শিল্পীর মনকে জাগাবার চেষ্টা না করে যারা উৎকট উৎসাহে টেকনিক শেখায়, তারা সেই ভুল করে। আরও একটা কথা। কলাভবনের ছাত্রদের আমি শুধু শিল্পের ছাত্র হিসেবে দেখি না—দেখি এক পরিবারের লোক হিসেবে। আমার উন্নতি-অবনতির সঙ্গে

তাদেরও উন্নতি-অবনতি বাঁধা। সব সময়ে যে আমরা একসঙ্গে উঠি বসি।

নন্দলাল বলে যান, পূজনীয় গুরুদেব যখন এখানে আমায় আশ্রয় দিলেন, বলেছিলেন, আমি শান্তিনিকেতনে এসে নিজে শিল্পের সাধনা করব—ইচ্ছেমত ছাত্র নেব। কেবলমাত্র এখানে যেন একটি শিল্পের আবহাওয়া গড়ে তোলবার সাহায্য করি। এই কারণে কলাভবন এখনো অ্যাকাডেমি হয়ে ওঠেনি। ছাত্রদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ গড়ে তোলাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে বলে কখনো বেশী ছাত্র নিতে পারিনা। প্রত্যেক বছরে কত জনকে ফিরে যেতে হয়। ইচ্ছে করলে ছাত্রদের থাকবার আরো কয়েক-খানা বাড়ি অনায়াসে করানো যায়। কিন্তু তাহলে এখানে একটি আর্ট স্কুল গড়ে উঠবে—কলাভবনের বিশেষত্ব আর থাকবে না। সংখ্যায় বেশী হয়ে গেলে ছাত্রদের সঙ্গে আর ব্যক্তিগত সম্বন্ধ থাকবে না।

নন্দলাল চুপ করলেন। তাঁকে চিন্তিত বোধ হল, কি যেন ভাবতে লাগলেন।

তাঁকে বিরক্ত না করে আমিও ভাবতে লাগলুম, বর্তমানে কলাভবনে ছাত্রের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়, প্রায় সত্তর জন। ছোট একটা আর্ট স্কুলের ছাত্রসংখ্যা। এইখানেই নন্দলালের কৃতিত্ব। শিক্ষা সম্বন্ধে একটা মস্ত বড় দুরূহ সমস্যার সমাধানের সম্মুখীন হয়েছেন। স্টুডিয়োতে অনুসরণ করা হয় যে-শিক্ষাপদ্ধতি, সেই পদ্ধতি দিয়ে একটা অ্যাকাডেমির কাজ চালাবার চেষ্টা করছেন। তাঁর পদ্ধতির মধ্যে তিনটি অপরিহার্য অঙ্গ। প্রথমতঃ, তিনি শিক্ষার ইউনিট ধরেন ক্লাসের ছাত্রগোষ্ঠী নয়—এক-একটি ছাত্র। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে নিবিড় সম্বন্ধ গড়ে তুলতে চান। অ্যাকাডেমির প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষক কম-বেশী একটা কারখানার নৈর্ব্যক্তিক যন্ত্রস্বরূপ।

তৃতীয়তঃ, তিনি অ্যানালিটিক পদ্ধতি মোটে পছন্দ করেন না। তিনি চান ছাত্রের মনের মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয়ের সম্বন্ধে অনুরাগ জাগাতে, বিচ্ছিন্নধারায় একটির পর একটি টেকনিক অভ্যাস করিয়ে সব ছাত্রকে দিয়ে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মাপাজোখা সিলেবাস শেষ করাতে চান না। ইওরোপে বড় বড় শিল্পীদের কেউ কেউ নিজের স্টুডিয়োতে মাত্র কয়েকজন ছাত্র নিয়ে কম-বেশী এ ভাবে এখনো কাজ শেখান। কিন্তু নন্দলালের একস্‌পেরিমেণ্ট হচ্ছে, একটা বিত্যালয়ের ছাত্রগোষ্ঠী নিয়ে এ পদ্ধতি অনুসরণ করা যায় কি না। একদিন ভারতবর্ষে এই পদ্ধতির একস্‌পেরিমেণ্ট সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে পর্যন্ত ব্যাপকভাবে হয়ে গেছে—টোলে টোলে ছাত্রদের মোটামুটি এই পদ্ধতিতেই শেখান হত। সে চেষ্টা ব্যর্থ হয় নি—একদিন সেই সব টোল থেকে শত শত মহাপণ্ডিতের আবির্ভাব হয়েছিল। তবু একথা বলতেই হবে, সাধারণতঃ টোলে ছাত্রসংখ্যা কম ছিল, তা কখনো আধুনিক বিত্যালয়ের আকার পায়নি।

কার্যতঃ সত্তর জন ছাত্রের দল নিয়ে নন্দলাল আপন পদ্ধতিতে কি ভাবে কাজ করেন, তা আরও স্পষ্ট করে জানবার জন্য জিজ্ঞাসা করলুম, কলাভবনে ত এখন প্রায় সত্তর জন ছাত্র আছেন। তাদের সকলের সঙ্গে আপনি কি ব্যক্তিগত সম্বন্ধ গড়ে তুলতে পারেন?

তিনি জবাব দিলেন, কি ভাবে করি একটা দৃষ্টান্ত দিই। যখন কোন ছবির কাজ করি, প্রত্যেক দিন তু-জন তু-জন করে ছাত্র বা ছাত্রীকে কাছে ডেকে নিই। তারা আমার সঙ্গে কাজ করে। তাদের সঙ্গে গল্প করি। শুধু শিল্পের গল্প নয়, নানা গল্প। এমনি ভাবে পালা করে সকলকে কাছে নিয়ে আসি। তারপর পিকনিক বা বিদেশে বেড়াতে যাবার সময় মেলামেশার একটা বড় সুযোগ পাই। ছেলেমেয়ে সব একসঙ্গে কাছে নিয়ে যাই—সারাদিন আলাপ-আলোচনা, কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে আমাদের যোগ সাধিত হয়। আগে খুব কম ছাত্র ছিল। তখনই আমি ভাল ভাবে এই পদ্ধতিতে কাজ

করতে পারতুম। এখন ক্রমশঃ ছাত্র বেড়ে চলেছে। আরও বাড়বে। এ পদ্ধতি তখন বদলাতে হবেই। এখনি মনে সমস্যা উঠেছে। প্রায়ই ভাবি, কি ভাবে তখন কাজ করা যাবে? একটা বিষয় ঠিক করেছি, আরও কিছু বেশী ছেলে হয়ে পড়লে আমি ও আর অন্য সকলে যাঁরা আছেন, প্রত্যেকের এক-একটা সম্পূর্ণ আলাদা ইউনিট করে দেব। যে যার নিজের দলকে শেখাবে। এখন যেমন সকলেই সকলের ছাত্র তখন আর তা থাকবে না। যাই বল, শিক্ষাক্ষেত্রে আমি ব্যক্তিগত সম্বন্ধকে খুব বড় জিনিস বলে গণ্য করি। এতে অবশ্য একটা ভয় আছে, পরে আমরা গুরু না হয়ে পড়ি। কিন্তু এই ভয় কেটে যাবে, যদি শিক্ষকেরা নিজেকে শিক্ষাব্রতী বলে মনে করেন আর নিজে শিল্পসৃষ্টি করতে থাকেন। আরও একটা কথা আছে। আজকাল আমরা যে পদ্ধতিতে কাজ করছি, তা সফল হয়ে উঠেছে এই জন্যই যে, আমরা যে কজন শিক্ষক আছি সবাই এক। আমাদের মধ্যে মনের কোন গরমিল নেই। আমি ওঁদের মনে জোর করে আমার মতামত চাপিয়ে দিই না। আমাদের পরস্পরের আনডারস্ট্যাণ্ডিং আমাদের এক করে রেখেছে। আর খুব ভাগ্যের কথা এই যে, আমরা সবাই এক পথে চিন্তা করছি—তা নাহলে বড় মুশকিল হত। আমাদের মধ্যে কোন লুকোচুরি নেই। আমাদের চিন্তার আদান-প্রদান অবাধভাবে চলে। হ্যাঁ, জিজ্ঞাসা করতে পার, বছর বছর এক দল পুরোতন ছেলেমেয়ে চলে যায়—তাদের জায়গায় আসে নতুন এক দল ছেলেমেয়ে। তারা এখানকার বিশেষ পরিমণ্ডলের সঙ্গে অনায়াসে নিজেদের মানিয়ে নেয় কেমন করে? এ কাজে সাহায্য করে পুরোতন ছেলেমেয়েরা। এই জন্যই কোর্স যথারীতি শেষ করার পরও কিছু ভাল ছাত্রছাত্রীকে এখানে রেখে দিই কয়েক বছর। তারা নতুন ছাত্রদের মধ্যে ট্র্যাডিশনটা সঞ্চারিত করে।

আমি বললুম, অন্য অন্য আর্ট স্কুলের চেয়ে শান্তিনিকেতনে পটো

সৃষ্টি করার কাজে আপনাদের একটা স্বাভাবিক সুবিধা আছে। এখানকার প্রকৃতি—একে লক্ষ না করে থাকা যায় না। মহাকবি শান্তিনিকেতন গড়ে তুলেছেন শিল্পী তৈরি করার পরিমণ্ডল করে।

তিনি বলতে লাগলেন, হ্যাঁ, এখানে নানান উৎসব আছে, অভিনয় আছে, গানের জলসা আছে। শান্তিনিকেতনের জীবনের সঙ্গে আমাদের জীবনের অবিচ্ছিন্ন যোগ। বিশেষতঃ, গানের ও নাচের মধ্যে দিয়ে আমাদের মন সরস হয়ে ওঠে।

আমি বললুম, আপনি যে-পদ্ধতিতে কাজ করছেন, এ আমাদের কাছে একেবারে নতুন জিনিস। এর জন্য আপনি কখনো কোন বাধা পান নি ?"

নন্দলাল জবাব দিলেন, না। রবিবাবু বরাবর আমাকে স্বাধীনতা ও উৎসাহ দিয়েছেন। কখন কোন সূত্রে এসে আমার কাজের ধারায় বাধা দেননি। আমি যে পদ্ধতিতে কাজ করি, সে ত তাঁরও মনের মত পদ্ধতি।

আলোচনা শেষ হলে বাসার দিকে যাত্রা করলুম। রাঙামাটির মাঠের উঁচু ডাঙার উপরে গড়ে উঠেছে শান্তিনিকেতনের আশ্রম। এখানে ওখানে যেন টুকরো টুকরো ছড়ানো ছোট বাড়িগুলি। সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকারে চারিদিক হয়ে উঠেছে রহস্যময়। মাথার উপরে বিরাট আকাশ বেঁকে দিগন্তে দিগন্তে হেলে পড়েছে, তার বুকে জ্বলে উঠেছে, ছোট ছোট কয়েকটি তারা।

চীনাভবনের বাসায় ফেরার পথে চোখে পড়ল এই রাঙামাটির মরুভূমির এক রহস্যময় সামগ্রিক রূপ।

মহাকবি নিজের সম্বন্ধে বলেছেন, "আমার বীণায় অনেক বেশী তার—সব তারে নিখুঁত সুর মেলানো বড় কঠিন। আমার জীবনে সবচেয়ে কঠিন সমস্যা আমার কবি-প্রকৃতি। হৃদয়ের সব অনুভূতির দাবিই আমাকে মানতে হল। * * * যেন একা গাড়িতে দশটা বাহন জুতে চালানো। তার সবগুলোই যদি ঘোড়া হত, তাহলে একরকম করে সারথ্য করা যেতে পারে। মুশকিল এই যে, এর কোনটা উট, কোনটা হাতি, কোনটা ঘোড়া, আবার কোনটা ধোবার বাড়ির গাধা—ময়লা কাপড়ের বাহক। এদের সকলকে এক-রাশে বাগিয়ে একচালে চালাতে পারে, এমন মল্ল কজন আছে! * * *"

বইখানিতে এই বহুরূপী রবীন্দ্রনাথের আলোচনা করা হয়েছে।